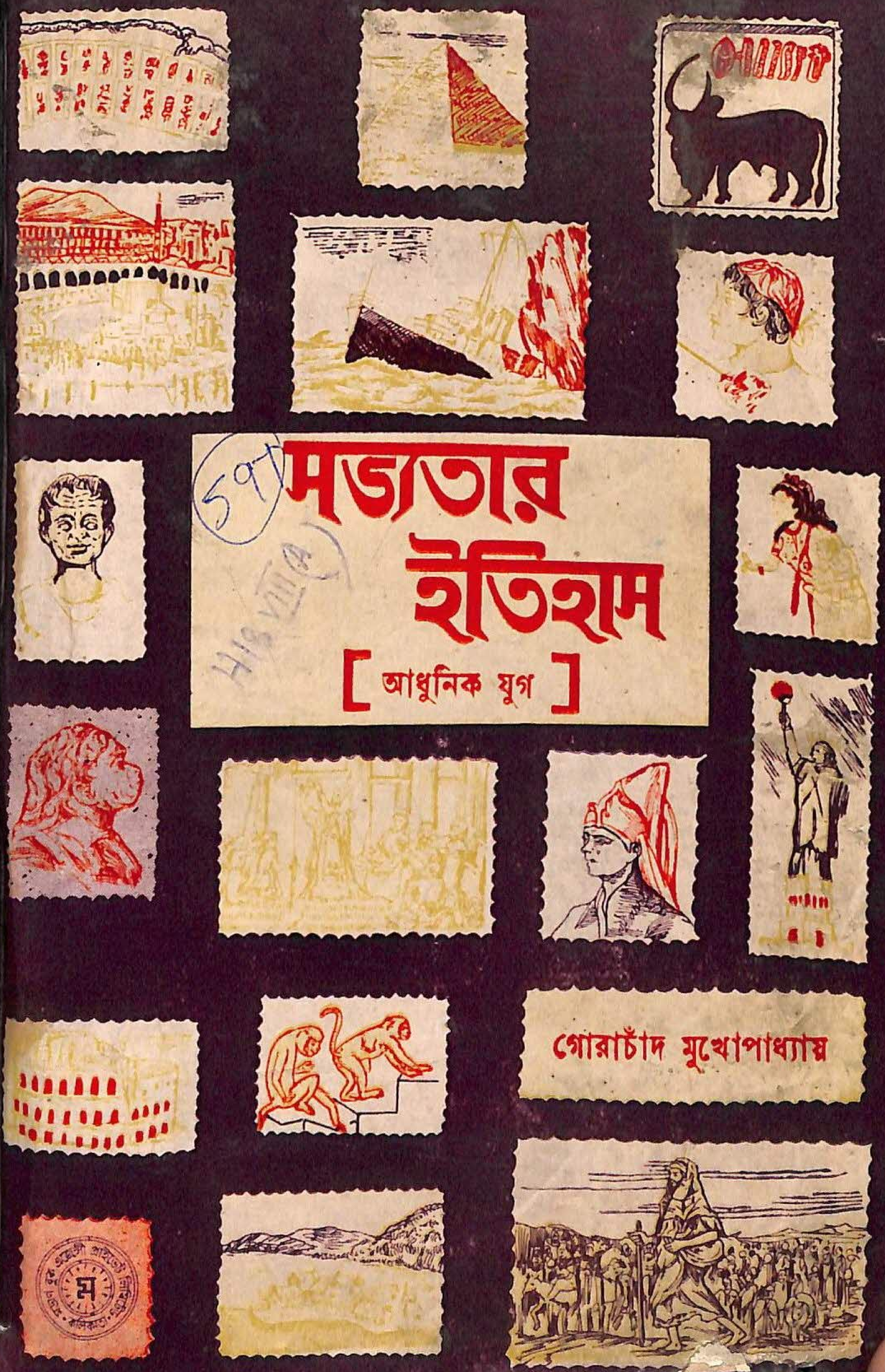


সভ্যতার ইতিহাস

[আধুনিক যুগ]

গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের নূতন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত।
[Vide : Submission No. Syll./H/VIII/82/7 dated 28. 12. 82.]

সভ্যতার ইতিহাস

[আধুনিক যুগ]
(অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

শ্রীগোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ.
ইতিহাসের অধ্যাপক, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

পঞ্চম (পুনর্মুদ্রণ) সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৫
ষষ্ঠ (পুনর্মুদ্রণ) সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৬
সপ্তম সংস্করণ : এপ্রিল, ১৯৮৬
অষ্টম পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৮৭
নবম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৮

মূল্য : ১৬ টাকা

[ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্পমূল্য কাগজে মুদ্রিত]

নির্ধারিত মূল্য ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

মুদ্রাকর :
সি বি. অফ্‌সেট
২৪এ, বাগমারী রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক যুগ

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতিঃ মধ্যযুগের অধিকাংশ সময় পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্ত প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এমন কি, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভূমিদাস কৃষকগণ সামন্তপ্রভুদের গৃহকর্মে ও খাস জমিতে খাটিবার বাধ্যবাধকতা মানিয়া লইত। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হইয়াছিল। কারণ, ইতিমধ্যে পশ্চিম ইউরোপে বণিক শক্তির উত্থান ও বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছিল। বাণিজ্য বিস্তারের সহিত মুদ্রাতন্ত্রের বিকাশ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মুদ্রা ও বিনিময়ের প্রচলন ব্যাপ্ত হইবার ফলে এক্ষণে ভূমিদাসগণ সামন্তপ্রভুদের পাওনাগণ্ডা মুদ্রা দ্বারা মিটাইয়া দিয়া তাহাদের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভে সচেষ্ট হইয়াছিল। অন্যপক্ষে নূতন নূতন ভোগ্যপণ্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত সামন্তপ্রভুগণও থোক টাকার বিনিময়ে ভূমিদাসদিগকে বাধ্যতামূলক শ্রম হইতে অব্যাহতি দিতে রাজি হইলেন। এ-ছাড়া, এই সময় পশ্চিম ইউরোপে বাণিজ্যকেন্দ্রিক বহু নগরের উত্থান হইয়াছিল। ঐ সকল নগরে সহজে কাজকর্ম জুটিত বলিয়া বহু ভূমিদাস কৃষক শহরাঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর প্লেগ মহামারীর (ব্লাক্ ডেথ্) প্রকোপে পড়িয়া বহু প্রাণ বিনষ্ট হয়। স্বভাবতঃই কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিল এবং কৃষিদ্রব্য উৎপাদন হ্রাস পাইল। এমতাবস্থায় সামন্তপ্রভুগণ বলপূর্বক ভূমিদাস প্রথা পুনঃপ্রবর্তনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন আর সামন্ততন্ত্রের আদিরূপে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হইল না।

সামন্ত প্রথার অবক্ষয়

কৃষি উৎপাদন প্রণালীর কিছু উন্নয়নঃ দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সেই কারণেই কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু তখন সামন্ত প্রথা ও ভূমিদাস প্রথা অবলুপ্তির পথে। এমতাবস্থায় শহরাঞ্চলের বহু পুঁজিসম্পন্ন নিয়োজক জমিতে টাকাকড়ি খাটাইয়া অধিক উৎপাদনে আগ্রহী হইল। এ-ছাড়া, কৃষিদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকগণও নূতন নূতন ক্ষেত তৈয়ারিতে মনোযোগ দিয়াছিল। কৃষিদ্রব্য উৎপাদন প্রণালীর উন্নয়ন হইল। ইতিপূর্বে পশ্চিম ইউরোপে একই জমিতে বারবার চাষ না করিয়া মাঝে মাঝে জমি পতিত রাখিবার রীতি ছিল। এক্ষণে একই জমিতে পর পর একই শস্য বপন না করিয়া মাঝে মাঝে অন্য শস্য বপন করিয়া জমির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার রীতি চালু হইল। এ-ছাড়া, ব্যাপক চাষের পরিবর্তে, কৃষিজমিতে নিবিড় চাষের পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।* অধিকন্তু কৃষিকর্মের উপযোগী সাজ-সরঞ্জামের উন্নতি ও জমিতে গোবর-সার প্রয়োগের প্রচলন উৎপাদন-বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল।

শিল্পোৎপাদনক্ষেত্রে উন্নয়নের পশ্চাতে নূতন নূতন ফসল উৎপাদনের অবদান ঃ একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের মধ্য ও উত্তর-ভাগে শিল্পজ পণ্য উৎপাদনের প্রসার ঘটে। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে প্লেগ মহামারীর প্রকোপে ও শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইউরোপে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এই অবস্থা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। স্বভাবতঃই ইহার ফলে ইউরোপে শিল্পের প্রসার রুদ্ধ হইয়াছিল, কারণ তখন শিল্পে বিনিয়োগ করিবার মত পুঁজির অভাব দেখা দিয়াছিল। কিন্তু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী জুড়িয়া ইউরোপীয় দেশগুলি নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারে বাহির হইলে উহার পরোক্ষ ফল হিসাবে বহির্বিশ্বের নূতন নূতন ফসলের সন্ধান পাওয়া গেল। আমেরিকা হইতে আলু, টমেটো ও ভুট্টার চাষ ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ক্রীতদাস নিয়োগ করিয়া ইক্ষু চাষের ফলে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইল। ক্রমে ইউরোপের বাজারে ঐ সকল ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে তদানীন্তন নিয়োজকগণ শিল্পের জন্য মূলধন সংগ্রহের নিমিত্ত নূতন নূতন

* History of Mankind : The Foundations of the Modern World, Vol. IV, Part I : by Louis Go Hschalk, P, 53.

ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত হইয়াছিল।* ইহার ফলে শিল্পে বিনিয়োগ করিবার মত পুঁজির সংস্থান হইল এবং শিল্পোদ্যোগের প্রসার ঘটিল।

ইহার প্রভাব ঃ এইভাবে ইউরোপে শিল্পোদ্যোগের প্রসার ঘটিলে যে-পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল, তাহাতে ধনতন্ত্রের প্রসার হইল অনিবার্য। কারণ, এই অবস্থায় একদিকে যেমন অবক্ষয়প্রাপ্ত সামন্ত শক্তির উপর রাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া প্রত্যেক দেশের রাজন্যবর্গ শিল্পপতি ও বণিকদের সাহায্য লইয়াছিল, সেইরূপ অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে লব্ধ অর্থের সাহায্যে ইউরোপের দেশগুলি উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী হইল।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. বণিক শক্তির উত্থান, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মুদ্রাতন্ত্রের প্রসার—সামন্তদের ভোগ্যবস্তু ক্রয়ের ইচ্ছা এবং ভূমিদাস কৃষকদের শহরাঞ্চলে অর্থ উপার্জন এবং সামন্ত-প্রভুদের নিকট হইতে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিলাভ প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক-প্রথার অবক্ষয়ের সূচনা করিয়াছিল।

২. দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই কারণে কৃষিদ্রব্যের চাহিদা—পুঁজিসম্পন্ন নিয়োজকদের জমিতে অর্থলগ্নি—কৃষিজমির উর্বরতা বৃদ্ধি।

৩. ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে নূতন নূতন ফসলের সন্ধান ও চাষ এবং নূতন নূতন ফসল উৎপাদনের জন্য পুঁজিপতিদের জমিতে অর্থলগ্নি। এইভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া ঐ সকল পুঁজিপতিগণ কর্তৃক ঐ অর্থ শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ।

৪. শিল্পোদ্যোগ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি ধনতন্ত্রের প্রসার, উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহ।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। মধ্যযুগের শেষে কিরূপে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হইয়াছিল? ২। মধ্য-যুগের শেষ ভাগে কৃষি উৎপাদন প্রণালীর ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হইয়াছিল? ৩। ইউরোপে নূতন নূতন ফসল উৎপাদন কিভাবে শিল্পোদ্যোগের প্রসার ঘটাইয়াছিল?

* Ibid.

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) বাণিজ্য-বিস্তারের ফলে পশ্চিম ইউরোপে কিভাবে অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটিয়াছিল ? (২) সামন্ত প্রথা অবলুপ্তির পর কাহারা ভূমিতে অর্থলগ্নি করিতে আগ্রহী হইয়াছিল ? ঐ সময় কৃষি উৎপাদন প্রণালীর ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ? (৩) ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতির প্রভাব সম্পর্কে কি জান ?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মধ্যযুগের অধিকাংশ সময় পশ্চিম ইউরোপে কোন্ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ? (খ) কোন্ ব্যবস্থা চালু হইবার ফলে ভূমিদাসগণ সামন্ত প্রভুদের পাওনা-গণ্ডা মিটাইতে সমর্থ হইয়াছিল ? (গ) কি কারণে কৃষকগণ শহরাঞ্চলে আশ্রয় লইত ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) ......ক্রয় করিবার নিমিত্ত সামন্ত, প্রভুগণ......বিনিময়ে ভূমিদাসদের শ্রম হইতে অব্যাহতি দিতেন। (২) চতুর্দশ শতাব্দীতে......মহামারীর প্রকোপে পড়িয়া বহু প্রাণ বিনষ্ট হয়। (৩) নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের পরোক্ষ ফল হিসাবে বহির্বিশ্বের......সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। (৪) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ক্রীতদাস নিয়োগ করিয়া......চাষ হইত।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) উপার্জনের জন্য ভূমিদাস কৃষকগণ কোথায় আশ্রয় লইত ? (২) কি কারণে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল ? (৩) আমেরিকা হইতে কোন্ কোন্ ফসলের চাষ ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপের নবজাগরণ

সূচনা ঃ আধুনিক যুগের ইতিহাসের সূচনার সহিত 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণের সম্পর্ক অতি নিবিড়। কারণ, অনেকের মতে নবজাগরণের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক যুগের সূচনা হইয়াছে।

নবজাগরণের অর্থ

'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ কথাটির অর্থ হইতেছে পুনরুজ্জীবন, কিন্তু নবজাগরণ কখন শুরু হইয়াছিল এবং কখনই বা ইহার অবসান হইয়াছিল তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নাই। মানুষ মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগে হঠাৎ আসিয়া পৌঁছে নাই। এইরূপ বিরাট পরিবর্তন একদিনে আসে নাই। সাধারণতঃ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতনের দিন হইতে নবযুগের সূচনা ধরা হয়।

কনস্টান্টিনোপলের পতনের গুরুত্ব

ইউরোপের ইতিহাসে কনস্টান্টিনোপলের পতন নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ কনস্টান্টিনোপল ছিল গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবাসস্থল। তাই কনস্টান্টিনোপলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বসবাসকারী গ্রীক পণ্ডিতগণ বহু মূল্যবান পুঁথিপত্রসহ ইউরোপের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। এক্ষণে ঐ সকল পণ্ডিতগণের চেষ্টায় বহু লুপ্তপ্রায় গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতির পুনরুদ্ধার হয়। স্বভাবতঃই কনস্টান্টিনোপলের পতন ইউরোপে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল।

নবযুগের সূচনা

বাস্তবিক পক্ষে এই যুগ-পরিবর্তন একদিনে ঘটে নাই, বহুকাল ধরিয়া আস্তে আস্তে ঘটিয়াছিল, মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপ এক অবস্থায় স্থিরভাবে ছিল না, ক্রমশঃ উন্নতির দিকে আগাইতেছিল। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমশঃ বিকাশ হইতেছিল। বিদ্যাচর্চার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে নবজাগরণ দেখা দিতেছিল।

(ক) নবজাগরণের স্বরূপ ঃ নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন। ইহার ফলে সাহিত্যে ও চিত্রভাস্কর্যে গ্রীক জীবনদর্শনের প্রবেশ ঘটিল এবং সে-জীবনদর্শন ছিল যুক্তি-নির্ভর এবং খ্রীষ্টীয় জীবনদর্শন হইতে পৃথক। এ-ছাড়া, নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসন্ধান। মধ্যযুগের মানুষ ছিল অন্ধবিশ্বাসী। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটিল। কারণ, যুক্তি ভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছিল একেবারেই অসম্ভব। ফলে, এখন হইতে মানুষ সব বিষয়ে নিজে অনুসন্ধান করিয়া সত্যে পৌঁছিতে চাহিল। দর্শনও হইল বিজ্ঞান-নির্ভর। বিজ্ঞান হইল নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ-নির্ভর। প্রাচীন গ্রীক জীবনচর্চার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। মানুষ জীবনে নূতন আনন্দের সন্ধান পাইল এবং আনন্দের সহিত জীবন উপভোগ করিতে লাগিল।

বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসন্ধান—যুক্তিবাদের প্রসার

এ-দিকে মধ্যযুগের শিক্ষা, চিন্তা ও ধর্মের ক্ষেত্রে চার্চের অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। সে-যুগের দর্শনও ইহা সমর্থন করিত। জাগতিক ক্রিয়াকর্ম অপেক্ষা পারলৌকিক চিন্তার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল এবং ঐ ধর্মান্ধ সমাজ-ব্যবস্থায় যাজক সম্প্রদায় মানুষের জীবনধারাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিত। এই অবস্থা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু ইহার পর এবং বিশেষতঃ চতুর্দশ শতাব্দী হইতে মানুষ শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইল না। যুক্তিতর্কের দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের মূল্যায়ন শুরু করিল। অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃতের জন্য আর মনের দরজা-জানালা খুলিয়া রাখা সম্ভব হইল না। ফলে, মানুষের গতানুগতিক সংস্কারকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য ক্যাথলিক চার্চের সমস্ত প্রয়াস স্বভাবতঃই ব্যর্থ হইল।

ইতালিতে নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ

(খ) ইতালির নেতৃত্বদান ঃ নবজাগরণ প্রথম শুরু হয় ইতালিতে। ধর্ম-যুদ্ধের সময়ে ইতালীয় বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস প্রভৃতি ইতালীয় নগরগুলি সমৃদ্ধিশালী

হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল নগরে রাষ্ট্রই ছিল সর্বেসর্বা এবং তথাকার চার্চসমূহ আর রাষ্ট্রের কাজকর্মে বাধা দিতে পারিত না। এ-দিকে সেই সময় ইতালিতে কতিপয় প্রতিভাশালী মনীষীর জন্ম হইয়াছিল। আবার সুপ্রাচীন গ্রীস বা শেক্স্‌পীয়ার-এর আমলে ইংলণ্ডের ন্যায় সেই সময় ইতালিতে প্রতিভা বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। ঐরূপ পরিস্থিতিতে সেখানকার নগরসমূহ বা শাসকশ্রেণী নিজ নিজ এলাকায় শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য একে অপরকে ঈর্ষার চোখে দেখিত। প্রথমে ফ্লোরেন্সের ধনী বণিকগণ এইরূপ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। ক্রমে ইহার প্রভাব মিলান, রোম ও অন্যান্য নগররাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়ে এবং সর্বত্র শাসক-শ্রেণী ও বণিকশ্রেণী শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য উদার হস্তে দান করিতে থাকে।

প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ—শাসকশ্রেণীর পারস্পরিক ঈর্ষা

এ-দিকে ইতালির অপেক্ষা অনেক মন্থর গতিতে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়াছিল। কারণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে উত্তর ইউরোপ অনেক পিছাইয়া ছিল। স্বভাবতঃই আল্পস পর্বত অতিক্রম করিয়া ইতালীয় নবজাগরণের উত্থান প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পর উত্তর ইউরোপের জার্মানী, পর্তুগাল, স্পেন, নেদারল্যাণ্ড, ফ্লাণ্ডার্স, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে নবজাগরণের উন্মেষ হইয়াছিল। এমন কি, এই পর্যায়ে নবজাগরণের চরিত্রও বদলাইয়া গিয়াছিল। কারণ, উত্তর ইউরোপের মানবতা-বাদিগণ ইতালীয় নবজাগরণের প্রভাবে সুপ্রাচীন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের চর্চায় মগ্ন থাকিলেও সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। তাঁহারা সুপ্রাচীন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-সমূহের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম-সংক্রান্ত পুঁথিসমূহেরও চর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

রেনেসাঁস-এর আল্পস পর্বত অতিক্রম

(১) চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা মানবতাবাদ

সূচনা ঃ মধ্যযুগে সাহিত্য ও শিল্পের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও খ্রীষ্টধর্মের সাধুসন্তদের মূর্তিগঠন ও চিত্রাঙ্কন। এই ধর্ম-সংক্রান্ত

ব্যাপার বাদ দিয়া মানবতা ও মানুষের সম্বন্ধে এখন নূতন করিয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। বস্তুতঃ এই সময় প্রাচীন গ্রীস ও রোমের চিন্তা ও কর্মের ধারা পুনরুজ্জীবিত হইয়া মানুষের মহিমা কীর্তিত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমানদের আচার-আচরণ ও ধর্ম-বিশ্বাস ছিল বেশ সহজ ও সরল। তাঁহাদের সভ্যতাকে বলা হইত পেগান সভ্যতা। বস্তুতঃ মানবতাবাদিগণ ছিলেন বহুলাংশে পেগান সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক। তবে ঐ সভ্যতায় মানবতাবাদ প্রাধান্য পাইলেও ভক্তিমূলক ধর্মের প্রবল প্লাবনে তাহা ছিল সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। কিন্তু এক্ষণে দর্শন-নির্ভর মানবতাবাদের উন্মেষ হইয়াছিল।

দর্শন-নির্ভর মানবতাবাদ

ইতালি ঃ মানবতাবাদের উন্মেষের সহিত ইতালীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে দান্তে, পেত্রার্ক ও বোকাচিও'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা তিনজনেই ছিলেন ফ্লোরেন্সের টাসকান অঞ্চলের বাসিন্দা। স্বভাবতঃই সাহিত্যের ভাষা হিসাবে ইঁহারা টাসকান ভাষাকেই সমৃদ্ধ করেন। ক্রমে ঐ ভাষাই সমগ্র ইতালীয় সাহিত্যের ভাষা হিসাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই-ভাবে ল্যাটিন ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হইয়াছিল।



দান্তে

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দান্তে, তাঁহার প্রথম পর্যায়ের রচনাদি সম্পূর্ণ করেন। এইগুলির মধ্যে তিনি তাঁহার মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি' লিখিয়া বিখ্যাত হন। পেত্রার্ক ছিলেন একাধারে কবি ও মানবতাবাদী এবং প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণের চিন্তাধারাপুষ্ট ব্যক্তি। তিনি বহু গীতিকাব্য রচনা করেন এবং সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম পথিকৃৎ হিসাবেও তিনি

দান্তে

পেত্রার্ক

স্মরণীয়। বোকাচিও'র প্রধান কৃতিত্বই ছিল গদ্য রচনা। তিনি 'ডেকামিরন' বা দশ রাত্রির গল্প নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইতালির গদ্য-সাহিত্যে নূতন ধারার সূচনা করিয়াছিলেন। ইতালীয় গদ্য-সাহিত্যের প্রসারের ক্ষেত্রে মেকিয়াভেলী রচিত 'প্রিন্স' নামক রাজনৈতিক গ্রন্থেরও উল্লেখ করা চলে। তিনিও ছিলেন ফ্লোরেন্সের লোক এবং ঐ গ্রন্থে তিনি রাজাদের কিভাবে চলা উচিত, সেই কথা লিপিবদ্ধ করেন। সাধারণ মানুষকে যে-সকল ন্যায় ও ধর্ম মানিয়া চলিতে হয়, রাজার পক্ষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সে-সকল মানিবার দরকার নাই; কিন্তু রাজ্য শাসনের জন্য তাঁহার পক্ষে ধার্মিকের ভান করা ও ধর্মকে সমর্থন করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে মেকিয়াভেলী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক চিন্তার সূত্রপাত করেন।

বোকাচিও

মেকিয়াভেলী



পেত্রার্ক



মেকিয়াভেলী

ইংলণ্ড: ইতালির পর সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন চসার (১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ) বস্তুতঃ নবজাগরণের প্রভাবে

চসার

ইংলণ্ডে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহার উৎসমুখ ছিল চসার রচিত 'ক্যান্টারবেরী টেইলস' নামক কাব্যগ্রন্থ।

রাণী এলিজাবেথের সময়ই প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সূচনা হয়। ঐ সময়ে উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রীঃ), স্পেন্সার, ফ্রান্সিস্ বেকন্ প্রভৃতি মনীষিগণ সাহিত্যে নূতন জীবন ও নূতন ভাবধারা আনিয়াছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়ার, স্পেন্সার, বেকন্



শেক্‌স্‌পীয়ার

নবজাগরণের ঢেউ ইতালি হইতে ফ্রান্সে এবং তাহার পার্শ্ববর্তী দেশ স্পেনে পৌঁছিয়াছিল। ইহার ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী সাহিত্যে তীব্র আলোড়ন দেখা দেয়। এই সময় ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রাবেলে তাঁহার রচনায় সমসাময়িক সমাজের দোষ-ত্রুটি তুলিয়া ধরেন। ফ্রান্সের ন্যায় স্পেনের সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক দোষ-ত্রুটি ছিল এবং সেখানে মধ্যযুগের ধ্যানধারণা নবজাগরণের আবির্ভাবের বহুকাল পরেও অব্যাহত ছিল। এমতাবস্থায় স্পেনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সারভান্তিস্ 'ডন কুইক্‌সোট' নামক ব্যঙ্গ উপন্যাস রচনা করিয়া নূতন যুগের স্পন্দন জাগাইয়াছিলেন।

ফ্রান্স ও স্পেন



ইরাসমাস

নবজাগরণের প্রভাবে ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নেদারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী দার্শনিক

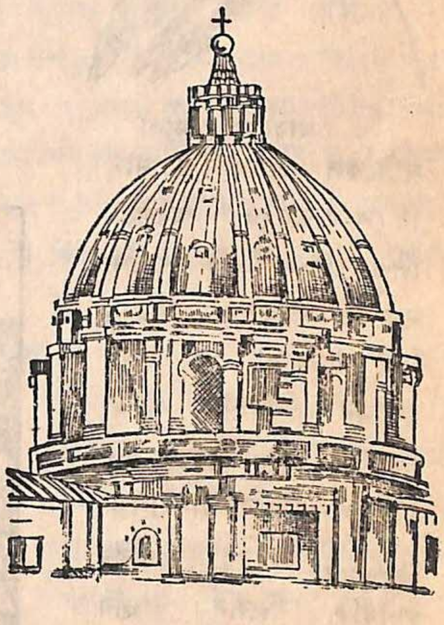
ইরাসমাসের অবদান স্মরণীয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা ও অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি তাঁহার যুগ-যন্ত্রণাকে তুলিয়া ধরেন। তিনি চার্চের নানা ক্রিয়াকর্মের সমালোচনা করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহাকে মার্টিন লুথারের পথপ্রদর্শক বলা হয়। তিনি সুপ্রাচীন ল্যাটিন ভাষার সংস্কার ও উন্নতিতেও ব্রতী হইয়াছিলেন।

ইরাসমাস

(২) শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

সূচনা ঃ সাহিত্যের ন্যায় অঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পেও নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল। মধ্যযুগে রীতি ছিল ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়বস্তু লইয়া চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর-শিল্পের নির্মাণ। কিন্তু এক্ষণে বিত্তশালী ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্পীদের স্বাধীনভাবে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর শিল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। জাগতিক দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য লইয়া অঙ্কিত চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। গির্জা ও প্রাসাদ নির্মাণে মধ্যযুগের গথিক রীতির বদলে গ্রীস ও রোমের স্থাপত্য রীতির সৌন্দর্য নূতন করিয়া চালু হইল। প্রাচীন গ্রীসের ডোরিক ও আইয়োনিক ও করিন্থীয় ধরনের থাম ও খিলান ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ফলে, তখন হইতে ছোটবড় সকল সৌধই এই রীতিতে নির্মিত হইতে থাকে। এই রীতি অনুসরণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে রোমের সেণ্ট্ পিটার্স গীর্জা নির্মিত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ



সেণ্ট্ পিটার্স গীর্জা

সে-যুগের শিল্পীদের মধ্যে লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল ও



মাইকেল এঞ্জেলো



রাফায়েল

মাইকেল এঞ্জেলো'র নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 'মোনালিসা' ও 'শেষ ভোজন' তাঁহার আঁকা বিখ্যাত ছবি। ফ্লোরেন্সের মাইকেল এঞ্জেলো নানা শিল্প-কলায় বিশারদ ছিলেন। ছবি আঁকিতে, পাথরের মূর্তি গড়িতে ও ঘর-বাড়ির পরিকল্পনা তৈয়ারি করিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁহার নির্মিত 'ডেভিডের

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো



মোনালিসা

মূর্তি' ফ্লোরেন্সে রক্ষিত আছে। রোমের গির্জায় তাঁহার আঁকা 'শেষ বিচার'-এর ছবি জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু ছবি আঁকিয়া সবচেয়ে বিখ্যাত হইয়াছেন রাফায়েল। রাফায়েল মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই তিনি ছবি আঁকিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত ছবি 'ম্যাডোনা'-তে যীশু ও তাঁহার মাতার যে স্নিগ্ধ ও পবিত্র সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই অতুলনীয়।

রাফায়েল

(৩) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

সূচনা : শিল্প ও সাহিত্যের মত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ইংরাজ পণ্ডিত রজার বেকনের নাম উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের শেষদিকে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিলেও তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁহার যুগ অপেক্ষা প্রায় একশত বৎসর অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহের মধ্যে চশমার ও দুরবীনের কাচ ও বিবর্ধক কাচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং বারুদের আবিষ্কর্তা হিসাবেও তাঁহার নাম স্মরণীয়।

রজার বেকন্

রজার বেকনের আবির্ভাবের বহুকাল পরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডে ফ্রান্সিস বেকন্ (১৫৬১-১৬২৬ খ্রীঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সকল গ্রন্থে তিনি বিজ্ঞানীদের লইয়া এমন একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন যাহার সদস্যগণের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে। তিনি স্বয়ং কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান নাই, তবে ঐ সংক্রান্ত অনেক সূত্রের সন্ধান দিয়াছিলেন।



ফ্রান্সিস্ বেকন্

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি চিত্রশিল্পী হিসাবেই সাধারণের মধ্যে পরিচিত। কিন্তু



লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি

বিজ্ঞানী লিও-নার্দো-দা-ভিঞ্চি

ছবি আঁকা ছাড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যথা—পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব ও যন্ত্র-বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁহার গবেষণা ও সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারার বিকাশে সহায়তা করিয়াছিল। নানাবিধ যন্ত্র উদ্ভাবনেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এমন কি, উড়োজাহাজের পরিকল্পনাও তাঁহার মাথায় খেলিয়াছিল।

বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। বহুকাল আগে টলেমী নামক মিশরের এক গ্রীক পণ্ডিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, আর সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কোপারনিকাস্ (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ) নামক পোল্যাণ্ডের এক পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই নূতন কথা



কোপারনিকাস্

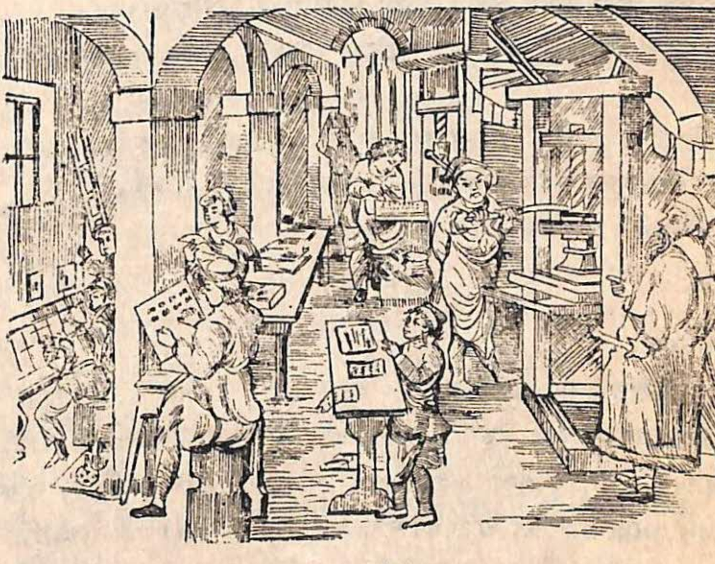


গ্যালিলিও

প্রচলিত বিশ্বাস ও খ্রীষ্টীয় চার্চের ধ্যানধারণার বিরুদ্ধ বলিয়া কোপারনিকাসের

দণ্ড হইত; কিন্তু ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এই মত প্রকাশিত হইল এবং সেই বৎসরই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া চার্চের কোপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহার পরে গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রী:) নামক এক ইতালীয় পণ্ডিত নূতন সত্য প্রচার করিতে গিয়া চার্চের কোপে পড়িলেন। গ্যালিলিও ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে এক শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে নক্ষত্রমণ্ডলী সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির করিলেন। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কার বাইবেলের ও চার্চের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাঁহাকে কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। শেষে তিনি তাঁহার মত ভুল বলিয়া স্বীকার করিয়া তবে নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সমস্ত জগৎ কোপারনিকাস্ ও গ্যালিলিও'র মত অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইল।

কোপারনিকাস্ ও গ্যালিলিও



ছাপাখানা

নবজাগরণের যুগে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার আবিষ্কর্তা ছিলেন জার্মানীর জন গুটেনবার্গ। ফলে নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো আরও বেশি ছড়াইয়া পড়িল। পূর্বে একখানি বই নকল করিতে অনেক সময় লাগিত এবং তাহাতে অনেক ভুল থাকিত। এখন ছাপাখানায় খুব তাড়াতাড়ি বহু বই একসঙ্গে ছাপা হওয়ায় অল্প মূল্যে ও সহজে বই পাওয়া গেল।

মুদ্রাযন্ত্র—জন গুটেনবার্গ

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের সূচনা। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন—গ্রীক পণ্ডিতদের ইউরোপে আগমন, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও বিদ্যাচর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নবজাগরণের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

২. গ্রীক ও রোমক জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, যুক্তিবাদের প্রসার প্রভৃতি নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুক্তিবাদের ক্রমবর্ধমান প্রসারের ফলে চার্চের অবাধ-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা।

৩. নবজাগরণে ইতালির নেতৃত্ব—অনুকূল পরিবেশ, অন্যান্য কারণ। ইউরোপের অন্যান্য দেশে নবজাগরণের প্রসার এবং বৈশিষ্ট্য।

৪. চিন্তার ক্ষেত্রে মানবতাবাদ—ধর্মীয় বিষয় বাদ দিয়া মানুষের জয়গান—ইতালি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের মানবতাবাদী সাহিত্যিকগণ।

৫. শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ, শিল্পীদের স্বাধীন সমাজ, স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ।

৬. বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ—ইংলণ্ড, পোল্যাণ্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নূতন নূতন আবিষ্কার। স্বাধীন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ২। নবজাগরণের উন্মেষে ইতালি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও নেদারল্যাণ্ড-এর ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ। ৩। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল ও মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র ও ভাস্কর্য সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৪। জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির ক্ষেত্রে কোপারনিকাশ ও গ্যালিলিও'র ভূমিকা আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) কখন উত্তর ইউরোপে নবজাগরণের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল? ইহার ফলশ্রুতি কি হইয়াছিল? (২) নবজাগরণের প্রভাবে মানবতাবাদের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল? (৩) নবজাগরণের উন্মেষে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

বিষয়মুখী ঃ

এক কথায় উত্তর দাও ঃ (ক) রেনেসাঁস যুগে গ্রীস ও রোমের স্থাপত্যরীতি অনুকরণে কোন্ গীর্জা নির্মিত হইয়াছিল ? (খ) কোন্ শিল্পী 'মোনালিসা' অঙ্কন করিয়াছিলেন ? (গ) রোজার বেকন কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ? (ঘ) কে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করেন ? (ঙ) কে 'ক্যান্টারবেরী টেইলস' রচনা করিয়াছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) কনস্টান্টিনোপল ছিল — সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবাসস্থল।

(২) মধ্যযুগের শেষের দিকে বিদ্যাচর্চার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে — গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(৩) নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রাচীন — জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন।

(৪) মধ্যযুগের মানুষ ছিল —।

(৫) মানবতাবাদিগণ ছিলেন — সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক।

(৬) দান্তে, পেত্রার্ক ও বোকাচিও ছিলেন ফ্লোরেন্সের — অঞ্চলের বাসিন্দা।

(৭) — 'ডিভাইন কমেডি' লিখিয়া বিখ্যাত হন।

(৮) মেকিয়াভেলি রচিত — রাজনৈতিক গ্রন্থ হিসাবে বিখ্যাত।

(৯) নবজাগরণের সময় ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন —।

(১০) — দেশের ঔপন্যাসিক সারভান্তিস্ — নামক ব্যঙ্গ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

(১১) 'মোনালিসা' ও 'শেষ ভোজন' হইল শিল্পী — অমর কীর্তি।

(১২) উড়োজাহাজের পরিকল্পনা — মাথায় খেলিয়াছিল।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও ঃ

(১) কনস্টান্টিনোপল কোন্ সভ্যতার আবাসস্থল ছিল ?

(২) কনস্টান্টিনোপলের পতনের ফলে কাহারা সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন ?

(৩) নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?

(৪) মধ্যযুগে কাহারা মানুষের জীবনধারাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিত ?

(৫) ইতালির নবজাগরণের সহিত উত্তর ইউরোপের নবজাগরণের তফাত কি ছিল ?

(৬) নবজাগরণের উন্মেষের ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে কিসের আলোচনা শুরু হইয়াছিল ?

(৭) নবজাগরণের প্রভাবে যে মানবতাবাদের জন্ম হইয়াছিল উহার সহিত পূর্বেকার মানবতাবাদের তফাত কি ছিল ?

(৮) ইতালির সাহিত্যিকগণ কোন্ ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন ?

(৯) 'ডেকামিরণ' গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন ?

(১০) রাবেলে কোন্ দেশের ঔপন্যাসিক ছিলেন ?

(১১) কোন্ শিল্পী চিত্রকলা ও ভাস্কর্য ছাড়াও অন্যান্য কলায় বিশারদ ছিলেন ?

(১২) কে দূরবীন আবিষ্কার করিয়াছিলেন ?

(১৩) গুটেনবার্গ কে ছিলেন ?

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

সূচনা : পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশগুলির ভৌগোলিক আবিষ্কার সভ্যতার ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু ইউরোপ ব্যতীত অপর কোনও দেশ এই বিপুল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ সমসাময়িক ইউরোপের পরিবর্তিত অর্থনীতি ও ইতালীয় নবজাগরণের প্রভাব।

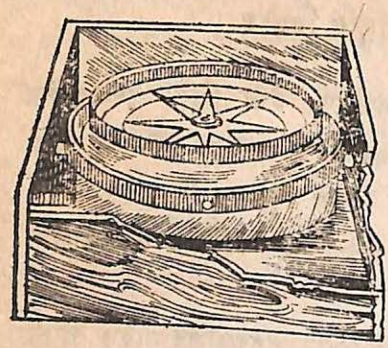
পরিবর্তিত অর্থনীতি

মধ্যযুগে ধর্মযুদ্ধের সময় ইতালীয় বাণিজ্য-প্রধান শহরগুলির সহিত প্রাচ্য দেশের যোগাযোগ ছিল। প্রাচ্যের মসলা, মূল্যবান পাথর, কাচ, পোর্সিলিন, সিল্ক, সাটিন, কম্বল প্রভৃতির পাশ্চাত্য দেশে যথেষ্ট কদর ছিল। ঐ সকল বস্তু ক্রয়ের ফলে ইউরোপের সোনা-রূপার পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। এমতাবস্থায় তুর্কীদের বিজয়-অভিযানের ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ব্যবসার যোগাযোগস্থল মুসলমানদের অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং নূতন বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করিয়া প্রাচ্যের সহিত সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির পক্ষে অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। এ-ছাড়া নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলে অনেক সোনা-রূপার সন্ধান পাওয়া যাইবে, এই আশাতেও অনেকে নূতন দেশ আবিষ্কারে উদ্যোগী হইয়াছিল।

নবজাগরণের প্রভাব

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই আবিষ্কারকদের মধ্যে কেহই কিন্তু নূতন দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নাই। পক্ষান্তরে, তাঁহারা পুরাতন দেশসমূহে পৌঁছাইবার জন্য নূতন পথ আবিষ্কারের উদ্যোগী হন। কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থনৈতিক তাগিদ থাকিলেও অজানা সমুদ্রের বিশাল বক্ষে পাড়ি দেওয়া ছিল বাস্তবিকই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার; তথাপি ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল নবজাগরণে মানুষের নূতন নূতন সত্য ও জ্ঞানলাভের ফলে। পৃথিবীর আকৃতি

যে গোলাকার, এই সত্য মানুষ জানিতে পারিল। সেই সঙ্গে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য কম্পাস এবং পথ ঠিক করিবার জন্য মানচিত্র ও নকশা বাহির হইল। Astrolable নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে দিগন্ত হইতে ধ্রুবতারার উচ্চতা মাপিয়া অক্ষরেখা নির্ণয় করা সম্ভব হইল।



কম্পাস

আ বি ষ্কা রে র কাহিনী : ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পর্তুগাল ও স্পেনই প্রধান ভূমিকা লইয়াছিল।

প্রিন্স হেনরী

পর্তুগালের রাজবংশের এক কুমার 'নাবিক হেনরী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে সমুদ্রযাত্রা করেন নাই। কিন্তু তাঁহারই চেষ্টার ফলে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ পরিবেষ্টন করিয়া সমুদ্রপথে পশ্চিম ইউরোপ হইতে দক্ষিণ এশিয়ায় আসিবার পথ আবিষ্কৃত হয় এবং আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশের গোড়াপত্তন ঘটে। তৎকালীন ভূগোলবিদ্‌দের একত্র করিয়া তিনি নৌ-বিদ্যার একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং সেখান হইতে সুশিক্ষিত নাবিকদিগকে আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কার করিতে পাঠাইতেন। তাঁহার জীবিতকালে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অর্ধেকটা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বারথেলোমিউ দিয়াজ—উত্তমাশা অন্তরীপ

তারপর পর্তুগীজ নাবিক বারথেলোমিউ দিয়াজ প্রবল ঝটিকা দ্বারা চালিত হইয়া ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার সর্ব-দক্ষিণস্থ অন্তরীপে পৌঁছান। দেশে ফিরিয়া তিনি এই অন্তরীপটির নাম রাখেন 'ঝটিকা অন্তরীপ' (The Cape of Storm), কিন্তু পর্তুগালের রাজা উহার নাম দিলেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ' (The Cape of Good Hope)। কারণ ইহার ফলে ভারত মহাসাগরে পৌঁছাইবার পথটি পর্তুগীজদের প্রায় দখলে চলিয়া আসে। ইহার পর পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা রাজধানী লিসবন হইতে যাত্রা

করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইলেন।

ভাস্কো-দা-গামা



ভাস্কো-দা-গামা

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক ভারতে পর্তুগীজদের গভর্নর নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে গোয়া ও মালাক্কা রাজ্য অধিকার করেন। বস্তুতঃ তিনিই ছিলেন ভারতের পর্তুগীজ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতা।

আলবুকার্ক

ইতিপূর্বে ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক কেব্রাল কতকগুলি জাহাজ লইয়া পৃথিবী পরিক্রমায় বাহির হন এবং প্রথমে ব্রেজিল এবং অতঃপর ভারতে পৌছান। ভারত হইতে তিনি মসলা সংগ্রহ করিয়া রাজধানী লিসবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

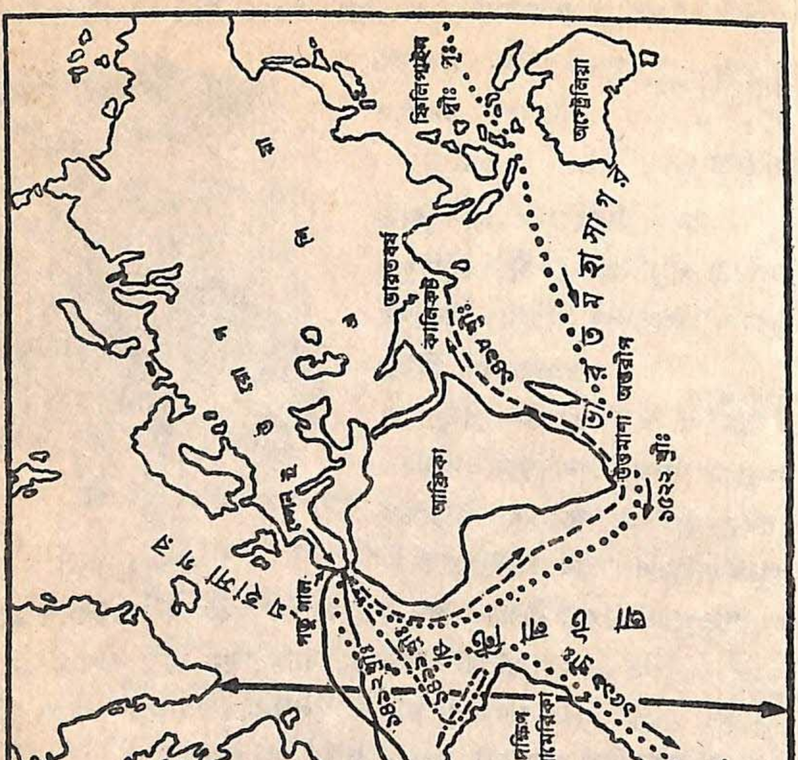
কেব্রাল

স্পেনের আবিষ্কার-যাত্রা ঃ পর্তুগালের নাবিকরা যখন আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতে পৌছাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে ক্রিস্টফার কলম্বাস নামে জেনোয়া নগরের এক ইতালীয় নাবিক একটি নূতন পথের প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, পৃথিবী যখন গোলাকার তখন আটলান্টিক মহাসাগর ধরিয়া বরাবর পশ্চিম মুখে গিয়া ভারতে শীঘ্রই পৌছান যাইবে। এই প্রস্তাব লইয়া তিনি নানাস্থানে ফিরিলেন, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত কেহই তাঁহার

কলম্বাস



কলম্বাস


আবিষ্কারকদের ভ্রমণপথ
ম্যাগেলানের ভ্রমণপথ
ভাস্কো-ডা-গামার ভ্রমণপথ
কলম্বাসের ভ্রমণপথ
আমেরিগো ভেসপুচির ভ্রমণপথ
পোপের নির্দিষ্ট সীমারেখা
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
আফ্রিকা
ভারতবর্ষ
কালিকট
উত্তমাশা অন্তরীপ
ফিলিপাইন্স
অস্ট্রেলিয়া

কথায় কর্ণপাত করিলেন না। শেষে স্পেনের রাণী ইজাবেলা কলম্বাসের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার স্বামীর মত করাইলেন। রাজা-রাণীর সাহায্যে তিনখানি ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস যাত্রা করিলেন। উনসত্তর দিন সমুদ্রযাত্রার পর তাঁহারা স্থলে আসিয়া পৌছাইলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আবিষ্কার

কলম্বাসের বিশ্বাস ছিল, তিনি ভারতের পশ্চিমস্থ দ্বীপে পৌঁছাইয়াছেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম হইল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। ইহার পর কলম্বাস আরও তিনবার সমুদ্রযাত্রা করেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে, তিনি একটি নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আমেরিগো ভেস্‌পুচি নামক ইতালির এক নাবিক ১৪৯৭ হইতে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারবার সমুদ্রযাত্রা করেন। তিনি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান ও দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। এগুলি যে এশিয়ার অংশ বা ভারত নহে তাহাও তিনি অনুমান করেন এবং তাঁহারই নামে নূতন মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।

আমেরিগো ভেসপুচি

আমেরিকা আবিষ্কারের পর ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালবোয়া নামক অপর একজন নাবিক বর্তমান পানামা প্রণালীর নিকটস্থ দ্বীপে উপস্থিত হন ও প্রশান্ত মহাসাগরের সন্ধান পান।

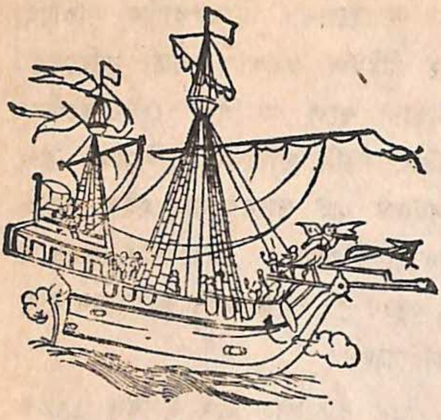
বালবোয়া

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক ম্যাগেলান স্পেনের রাজার সাহায্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন। তিনি স্পেন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে আটলান্টিক মহাসাগর ধরিয়া যাত্রা করেন এবং দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বর্তমান 'ম্যাগেলান' প্রণালী দিয়া প্রশান্ত

ম্যাগেলান


ম্যাগেলান

মহাসাগরে প্রবেশ করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। এইখানে তিনি একটি দাঙ্গায় নিহত হন এবং তাঁহার সঙ্গীরা ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর ধরিয়া আফ্রিকা ঘুরিয়া স্পেনে ফিরিয়া আসেন। উহাই সর্বপ্রথম নৌযানে ভূ-প্রদক্ষিণ।



ম্যাগেলানের জাহাজ

ফলশ্রুতি : নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলাফলও ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নূতন নূতন পথ আবিষ্কার, নূতন দেশের সন্ধান নহে। কিন্তু ঐ কার্যে লিপ্ত হইয়া ইউরোপের দুঃসাহসিক নাবিকগণের উৎসাহ ও তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ফলে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা বা ফিলিপাইন্‌সের মত নূতন নূতন ভূ-খণ্ডের সন্ধান মিলিয়াছিল। অজানা সমুদ্র ও দূরদূরান্তের দেশগুলি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। এ-ছাড়া, এই সকল আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় জাতিগুলির নব আবিষ্কৃত মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এক নূতন যুগের সূচনা হইল। ক্রমে এশিয়াখণ্ডে ভারত এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইউরোপের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র ইউরোপ বৃহত্তর ইউরোপে পরিণত হইল।

ভৌগোলিক জ্ঞান-বৃদ্ধি ও নব আবিষ্কৃত মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত পরিচিতি

দ্বিতীয়ত, ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগেলানের নেতৃত্বে জলপথে ভূ-প্রদক্ষিণ বাস্তবিকই এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইহার ফলে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, পৃথিবী গোলাকার ও সসীম। এই তথ্যের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক তাৎপর্য অপেক্ষা চিন্তার জগতে ইহার গুরুত্ব ছিল আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। কারণ, ইহা মধ্যযুগে প্রচলিত তত্ত্ব ও বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানিয়াছিল।

জলপথে ভূ-প্রদক্ষিণ

তৃতীয়ত, নূতন পথ ও নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলে বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্বভাবতঃই ইহার ফলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটিতে লাগিল। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামালের সংগ্রহ-ভাণ্ডার হিসাবে নূতন নূতন দেশগুলি দখল করিবার প্রয়োজন দেখা দিল। এ-ছাড়া, ইউরোপীয় দেশগুলির দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজন হইল বিপণির। এই সকল কারণে নূতন নূতন ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ঐ সকল স্থানে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল। কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে ঔপনিবেশিক শোষণ আরম্ভ হইল। ইউরোপীয় দেশগুলি দূরদূরান্তের দেশগুলি হইতে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর প্রভৃতি লুণ্ঠন করিল। স্বভাবতঃই ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রথার ক্রমোন্নতি এবং এশিয়া মহাদেশের অর্থনীতির ক্রম-অবনতি ঐতিহাসিক কারণে যুক্ত হইয়া পড়িল।

বাণিজ্য বিস্তার—উপনিবেশ স্থাপন—ঔপনিবেশিক শোষণ

স্পেনীয়রা কিন্তু বাণিজ্য লইয়া মাথা ঘামাইত না। তাহারা সৈন্যবাহিনী ও ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়া রাজ্যজয় ও ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিল। কলম্বাস স্পেনের রাজার হইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন। স্বভাবতঃই আমেরিকাতে প্রথম রাজ্যস্থাপন করিল স্পেন। এ-দিকে কর্টেজ নামক এক স্পেনীয় বীর পাঁচ-ছয় শত পদাতিক ও ষোলজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রা করিয়া মেক্সিকো দখল করিলেন এবং সেখানকার আদিম অধিবাসীদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিলেন (১৫১৯-১৫২১ খ্রীঃ)। ইহার কয়েক বৎসর পরে পিজারো নামক এক নির্দয় স্পেনীয় ভাগ্যান্বেষী দুই শত সৈন্য লইয়া পেরু জয় করিতে গেলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সেখানকার রাজাকে ধৃত ও নিহত করিয়া ঐ রাজ্য অধিকার করিলেন। এইভাবে আমেরিকায় স্পেনীয় সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। স্পেনীয়রা ক্রমশঃ বিজিত সাম্রাজ্যে রৌপ্যখনি আবিষ্কার, চাষের ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিল। তারপর সেখানে রৌপ্যখনিতে দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে খাটাইয়া স্পেন লাভবান হইতে লাগিল। এ-ছাড়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইক্ষুক্ষেত্রে প্রায় ছয় লক্ষ আদিম অধিবাসী

স্পেনীয় নাবিকদের রাজ্যজয়

আত্মাহুতি দিয়াছিল। এইভাবে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া স্পেনীয়গণ আদিম অধিবাসীদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিতে লাগিল। তাহাদিগকে জোর করিয়া চাবুক মারিয়া এত বেশি শ্রমসাধ্য কাজ করানো হইত যে, পরিশ্রমের চাপে ও অত্যাচারে তাহাদের মধ্যে অর্ধেক লোক মরিয়া গেল। বস্তুতঃ বিজিত সাম্রাজ্যের আদিম অধিবাসীদের শোষণের ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন ইউরোপের মধ্যে প্রধানতম শক্তিরূপে গণ্য হইল।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি হইল ভেনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি ইতালীয় নগরগুলির বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রাধান্যের অবসান। এখন হইতে ইউরোপের অপরাপর জাতিসমূহ বাণিজ্যিক সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হইল। ব্যবসায়-বাণিজ্য আর নগরসমূহের কারবাররূপে সীমাবদ্ধ রহিল না। এক্ষণে উহা সর্বতোভাবে জাতীয় কর্মকাণ্ডে পরিণত হইল। এই সঙ্গে স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিধিও পূর্বাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত হইয়াছিল। কারণ সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারের ফলে অচিরেই যে-ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সূচনা হইয়াছিল, তাহার সহিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলির স্বার্থও ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে জাতীয় জীবনে বড় রকমের পরিবর্তন আসিল। এতদিন অভিজাত শ্রেণী ও রাজার হাতে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি ন্যস্ত ছিল। এক্ষণে ব্যবসাদার ও ছোট ছোট ভূম্যধিকারিগণ সমাজে অধিকতর শক্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন এবং সেই সঙ্গে উঁহারা রাজনৈতিক শক্তিলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। ইহার ফলে ফ্রান্সে সামন্তদের 'মহতী সভা'র স্থলে স্টেট্‌স্ জেনারেল এবং ইংলণ্ডে নূতন যুগের প্রতিনিধি-সভা হিসাবে পার্লামেণ্ট গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল।

জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থান

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. পঞ্চদশ শতাব্দীর পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও নবজাগরণের ফল হইল ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে উৎসাহের সঞ্চার।

২. ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে স্পেন ও পর্তুগালের অগ্রণী ভূমিকা। ভারত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, আমেরিকা প্রভৃতি আবিষ্কার।

৩. ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলশ্রুতি ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, জলপথে ভূ-প্রদক্ষিণ, উপনিবেশ স্থাপন, ঔপনিবেশিক শোষণ।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মকঃ

১। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের মূল কারণগুলি বর্ণনা কর। ২। ভাস্কো-দা-গামার সমুদ্রযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত পর্তুগালের ভৌগোলিক আবিষ্কার পর্ব আলোচনা কর। ৩। ভাস্কো-দা-গামা ও কলম্বাস সম্পর্কে কি জান?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) ম্যাগেলনের ভূ-প্রদক্ষিণের গুরুত্ব কি ছিল? (২) কোন্ দেশ আমেরিকাতে প্রথম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল? (৩) কর্টেজ কে ছিলেন? পিজারো কোন্ রাজ্য জয় করেন? (৪) স্পেনীয়রা বিজিত সাম্রাজ্যে কিভাবে অত্যাচার করিত?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও : (ক) আলবুকার্ক কে ছিলেন? (খ) কেব্রাল কোন্ কোন্ দেশে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন? (গ) কলম্বাস কোন্ দেশের নাবিক ছিলেন? (ঘ) কাহার নাম অনুযায়ী আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ হইয়াছিল? (ঙ) বালবোয়া কোন্ মহাসাগরের সন্ধান পাইয়াছিলেন? (চ) কোন্ ঘটনা সর্বপ্রথম 'নৌযানে ভূ-প্রদক্ষিণ' নামে পরিচিত?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) পঞ্চদশ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে ব্যবসায়ের যোগাযোগ স্থল — অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। (২) দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য — আবিষ্কৃত হইয়াছিল? (৩) নাবিক হেনরীর জীবিতকালে আফ্রিকার — আবিষ্কৃত হইয়াছিল? (৪) — প্রবল ঝটিকা দ্বারা চালিত হইয়া আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণস্থ অন্তরীপে পৌছান। (৫) — ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। (৬) কলম্বাস ছিলেন জেনোয়া নগরের এক — নাবিক। (৭) — নামক ইতালির এক নাবিক দক্ষিণ আমেরিকায় পৌছাইয়াছিলেন? (৮) — নামক এক স্পেনীয় বীর মেক্সিকো আবিষ্কার করেন।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে ধ্রুবতারার উচ্চতা মাপিয়া অক্ষরেখা নির্ণয় করা সম্ভব হইত? (২) ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দেশ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল? (৩) ভাস্কো-ডা-গামা কোন্ দেশের লোক ছিলেন? (৪) দুইজন পর্তুগীজ নাবিকের নাম কর। (৫) কলম্বাস কোন্ রাণীর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন? (৬) কলম্বাস তাঁহার আবিষ্কৃত স্থান কোন দেশের অংশ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন? (৭) ম্যাগেলান প্রণালী কোথায় অবস্থিত?

চতুর্থ অধ্যায়

ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন

সূচনা : নবজাগরণ আল্পস পর্বত পার হইয়া উত্তরাভিমুখে গিয়া নূতন আকার ধারণ করিল। ইতালীয়দের মনে উহা একটি সহজ ও আনন্দময় জীবনের স্পন্দন আনিয়াছিল, কিন্তু জার্মান প্রভৃতি উত্তরের জাতিসমূহের মধ্যে উহার আর একটি সুফল দেখা দিল। চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারের প্রতি লোকের মনে একটি সন্দেহ জাগিল এবং তাহার ফলে প্রচলিত ধর্ম লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। এই আন্দোলনের নাম 'ধর্ম-সংস্কার'।

(ক) ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : মধ্যযুগ ছিল অন্ধবিশ্বাসের যুগ। ধর্মের নামে মানুষ অর্থ ও ভূমি দান করিত। ইহার ফলে রোমান ক্যাথলিক গীর্জাসমূহ ক্রমশঃ ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আর গীর্জার অধিকৃত ভূমি ও অর্থ ধর্মযাজকগণ নিজেদের বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যয় করিতেন। এমন কি, মহামান্য পোপ হইতে সামান্য ধর্মযাজক পর্যন্ত সকলেই অতিরিক্ত অর্থলোভী, বিলাসী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম-সংক্রান্ত শাস্ত্রাদির আলাপ-আলোচনা করিতেন না, বরং ধর্মের দোহাই দিয়া নানা অনাচার করিতেন। এই সকল কারণে রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিতে লাগিল।

যাজক সম্প্রদায়ের বিলাস ও দুর্নীতি

চতুর্দশ শতাব্দীতে জন ওয়াইক্লিফ্ নামে অক্সফোর্ডের এক অধ্যাপক প্রচলিত ধর্মের অনাচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলিতেন যে, কোন ব্যক্তির ঈশ্বরের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যাজকশ্রেণীর মধ্যস্থতার প্রয়োজন নাই, ধর্ম সম্বন্ধে বাইবেলের মতই সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে। সর্বসাধারণে যাহাতে বাইবেল পড়িতে ও বুঝিতে পারে, সেইজন্য তিনি ল্যাটিন হইতে ইংরাজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন।

জন ওয়াইক্লিফ্

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ড ও জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ওয়াইক্লিফের চিন্তাধারা বোহেমিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। ফলে সেখানে এক নূতন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্ম হয়, যাহার নেতা ছিলেন জন হাস নামক বর্তমান চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক। হাসের তত্ত্বসমূহ পোল্যাণ্ড ও বোহেমিয়ায় ক্যাথলিক চার্চের বিরোধী জনমত গঠনে সাহায্য করিয়াছিল। এই কারণে শীঘ্রই কনস্টান্সের ধর্মীয় সভায় হাসের ধর্মীয় চিন্তাধারা তীব্রভাবে নিন্দিত হইল এবং হাস স্থানীয় প্রশাসনের হাতে বন্দী হইলেন। শেষ পর্যন্ত হাসকে পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল। যাহা হউক, এইভাবে ইউরোপে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং জার্মানীতেই এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল।

জন হাস

মার্টিন লুথার : জার্মানীর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মার্টিন লুথার। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী লুথার ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে লুথারের পিতা প্রথমে স্যাক্সনির অন্তর্গত ম্যান্সফিল্ডের এক খনিতে কাজ করিতেন এবং ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া তিনি স্বয়ং একটি খনির মালিক হন। স্বভাবতঃই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল লুথার উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া আইনজীবিকা গ্রহণ করিবে। কিন্তু লুথার শিক্ষান্তে ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে একবার রোমে গিয়া সেখানকার চার্চের দুর্নীতি ও অনাচার দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তিনি পঠন-পাঠন-সংক্রান্ত বিষয়েই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অচিরেই একটি বিশেষ ঘটনা তাঁহাকে চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল।



মার্টিন লুথার

এই সময়ে রোমে সেণ্ট্ পিটারস গীর্জা নূতনভাবে গড়িবার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়। টাকা তুলিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করা হইল। প্রচার করা হইল যে, এই গীর্জা-নির্মাণ উপলক্ষে যিনি দান করিবেন তাঁহার সকল পাপ নাশ হইবে।

‘পাপক্ষয় পত্র’

এখানে উল্লেখ্য, গীর্জার নিয়ম ছিল যে, কোন পাপ করিয়া অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপের খণ্ডন হয়। উপবাস বা তীর্থযাত্রা করিলে, কিংবা গীর্জাকে ধর্মের কারণে ধন দান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। লোকের পাপক্ষয়ের নিমিত্ত তাহাদের নিকট ইন্‌ডালজেন্স বা ‘পাপক্ষয় পত্র’ বিক্রয় করা হইত।

এমতাবস্থায় জার্মানীতে ইন্‌ডালজেন্স বিক্রয়ের জন্য রোম হইতে টটজেল নামক এক ধর্মযাজক আসিলেন। তিনি বলিলেন, গীর্জার জন্য টাকা দিলে সমস্ত পাপ মোচন হইবে। টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়ায় তিনি আরও বলিলেন যে, এখন ইন্‌ডালজেন্স কিনিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে পাপ করিলে তাহা হইতেও মুক্তি পাওয়া যাইবে।

জার্মানীতে পোপের প্রতিনিধি

ধর্মের নামে এইরূপ অনাচার দেখিয়া লুথার অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উইটেন-বার্গ গীর্জার দরজায় ‘পাপক্ষয় পত্রের’ বিরুদ্ধে ৯৫টি যুক্তি সংবলিত এক ইস্তাহার টাঙাইয়া দিলেন। গীর্জার লোক লুথারকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং পোপ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন। ইহার জবাবস্বরূপ লুথার একটি জনসভা ডাকিয়া সেই সভায় পোপের দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ্য স্থানে পুড়াইয়া দিলেন এবং গীর্জার বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখিতে লাগিলেন। জার্মানীর সম্রাট ও রোমের পোপ একযোগে লুথারকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু/দেশের লোক অনেকেই লুথারের পক্ষে ছিলেন। স্যাক্সনির রাজা তাঁহাকে নিজের দুর্গে লুকাইয়া রাখেন। ঐ দুর্গে লুথার এক বৎসর কাল নির্জনে অতিবাহিত করেন এবং ঐ সময় তিনি জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ-কার্য সম্পন্ন করেন।

লুথারের প্রতিক্রিয়া

লুথারের মতামত : লুথারের সময় ক্যাথলিক গীর্জা এই কথা প্রচার

করিত যে, গীর্জার মাধ্যমে মানুষ মাত্রেই মোক্ষলাভ করিতে পারে এবং এই মোক্ষলাভ করিতে হইলে কিছু 'ভাল কাজ' করিতে হইবে। লুথার এই মত খণ্ডন করেন। লুথারের মতে মানুষ স্বভাবতঃই এত দুর্নীতিগ্রস্ত যে, তাহাদের পক্ষে ভাল কাজ করিয়া মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। সুতরাং মোক্ষলাভের সহজ উপায় হইল ঈশ্বরের অনুকম্পার প্রতি অবিচল আস্থা। এ-ছাড়া 'পাপক্ষয় পত্র' বিক্রয়ের প্রতিবাদে ৯৫টি যুক্তি সংবলিত প্রতিবাদ-পত্রে লুথার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে-সকল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তাহাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাগ্রস্ত, তাহারা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের অনুকম্পা অর্জন করিয়াছেন এবং ঐ জন্য 'পাপক্ষয় পত্র' ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই।

(খ) **ফলাফল :** ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে লুথার উইটেনবার্গে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তখন হইতে তিনি সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। অচিরেই তিনি নূতন চার্চ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং লুথারের জীবদ্দশায় অর্ধেক জার্মানী তাঁহার ধর্মমত ও গীর্জা-ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিল। ক্রমে সমগ্র উত্তর জার্মানীর সর্বত্র লুথারের গীর্জা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর এই ধর্মমত উত্তর ইউরোপ এবং বিশেষতঃ ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে লুথারের নেতৃত্বে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে যে-নূতন ধর্মমতের আবির্ভাব হইল, তাহা প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত নামে অভিহিত হইল।

প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রসার—জার্মানী, উত্তর ইউরোপ



অষ্টম হেনরী

ক্রমে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম সাগর পার হইয়া ইংলণ্ডে বিস্তার লাভ করে। ইংলণ্ডে সেই সময় টিউডর বংশীয় রাজা অষ্টম হেনরী (১৫০৯-৪৯)-র বিবাহবিচ্ছেদ-সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি লইয়া পোপের সহিত বিরোধের সূচনা হইয়াছিল। এই ঘটনার পরিণাম হইল অষ্টম হেনরী কর্তৃক ইংলণ্ডের গীর্জায়

পোপের প্রাধান্যের অবসান। ইংলণ্ডের গীর্জায় পোপের পরিবর্তে ইংলণ্ডের রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ভাবধারা চালু ছিল। এক্ষণে রাজা পোপের বিরুদ্ধে গেলেন বলিয়া ইংলণ্ডের লোকে অবাধে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।

ইংলণ্ড

প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের সন্নিহিত রাজ্য স্কটল্যাণ্ডে প্রসারিত হইল। রাণী মেরী স্টুয়ার্টের রাজত্বকালে স্কটল্যাণ্ডে এ-বিষয়ে নেতৃত্ব দেন জন নক্স।

স্কটল্যাণ্ড

(গ) ক্যাথলিক গীর্জার অভ্যন্তরীণ সংস্কার

(১) **সংস্কার ও সংহতির প্রয়োজন ঃ** ক্যাথলিক গীর্জার অনাচারের বিরুদ্ধে ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন চলিতেছিল। এক্ষণে প্রোটে-স্টাণ্ট ধর্মমত ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিয়া যে-ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাথলিক গীর্জা আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল। এই উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক গীর্জা প্রথমত আত্মশুদ্ধির দ্বারা নিজেকে দীর্ঘায়ু করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে পোপ তৃতীয় পলের নাম উল্লেখ্য। তিনি গীর্জার ত্রুটি সংশোধনে যত্নবান হন এবং ধর্মসংক্রান্ত কার্যে শিক্ষিত ও ধর্মভীরু লোকদের নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্তী পোপ চতুর্থ পল যাজকদের জীবন-যাত্রা ও আচরণ দেখিয়া যাহাতে জনমানসে ক্যাথলিক গীর্জার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, সেজন্য বহুবিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যাজকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন

আত্মশুদ্ধি ছাড়া ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কতিপয় দমনমূলক নীতিও গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই কারণে ধর্মদ্রোহী পুস্তকসমূহের একটি সূচী তৈয়ারি করা হইয়াছিল। এ-ছাড়া, ক্যাথলিক ধর্মে অবিশ্বাসীদের খুঁজিয়া বাহির করা হইত এবং অপরাধের তারতম্য অনুসারে কারাদণ্ড, বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, নির্যাতনের সাহায্যে স্বীকৃতি আদায় বা মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি দেওয়া হইত। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুড়াইয়া হত্যা করা হইত।

দমনমূলক নীতি প্রয়োগ

এই প্রসঙ্গে ক্যাথলিক যাজকদের বিচারসভা বা ইনকুইজিসান ব্যবস্থার কথা উল্লেখ্য। এই সকল আদালতে ক্যাথলিক ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের বিচার হইত। এই ব্যবস্থার ফলে স্পেনে মাত্র পনেরো বৎসরের মধ্যে দশ হাজার লোককে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করা হয় এবং প্রায় ৯০,০০০ লোককে অন্যান্য নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। এ-ছাড়া, এই ব্যবস্থা দক্ষিণ ইতালির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রসার প্রতিহত করিয়াছিল।

যাজকদের বিচারসভা

এ-দিকে ইতিমধ্যে পোপ তৃতীয় পলের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পোপের সাহায্যার্থে ও ধর্মীয় গোঁড়ামি রক্ষার্থে সামরিক আদর্শে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। গীর্জার দক্ষিণহস্তস্বরূপ এই সংগঠনের নাম ছিল জেস্যুইট্ সোসাইটি। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসে লোয়েলা নামেই প্রসিদ্ধ। প্রথম জীবনে তিনি সৈনিক ছিলেন এবং সেই কারণে এই সোসাইটির সভ্যগণের কাজকর্মে সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রাধান্য দেখা দিয়াছিল। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই সংঘ পোপের স্বীকৃতি লাভ করে।

জেস্যুইট্ সোসাইটি —লোয়েলা



লোয়েলা

জেস্যুইট্‌দের চেষ্টায় হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া ও দক্ষিণ জার্মানীতে ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে জেস্যুইট্‌দের অন্যতম প্রচারক ফ্রান্সিস জেভিয়ারের নাম বিশেষ স্মরণীয়। কারণ, মূলতঃ তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই ক্যাথলিক ধর্ম ভারত, জাপান ও সুদূর প্রাচ্যের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে জেস্যুইট্‌দের অবদান উল্লেখ্য। প্রায় দেড় শতাব্দী যাবৎ ইউরোপে বহু বিদ্যালয় খুলিয়া জেস্যুইট্ পাদরীগণ শিক্ষাদানে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, ক্যাথলিক ধর্মের প্রসারের জন্য জেস্যুইট্‌গণ এই সময় গোপন ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক কার্যেও লিপ্ত ছিলেন।

ফ্রান্সিস জেভিয়ার

ট্রেন্টের ধর্মীয় সভা ঃ জেস্যুইট্‌দের কর্মকাণ্ড শুরু হইবার অব্যবহিত পরেই ক্যাথলিক গীর্জার প্রধানগণ ইতালির উত্তরভাগের ট্রেন্ট শহরে এক ধর্মীয় সভা আহ্বান করেন। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সভার তিনটি বৈঠক হয়, যদিও ইহার মূল কাজকর্ম ১৫৪৫ হইতে ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সকল বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্যাথলিক গীর্জার অভ্যন্তরীণ সংগঠন ও প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার করা হইয়াছিল। ইহার ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানকে ক্যাথলিক ধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

(২) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ

সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ ঃ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনরাজ পঞ্চম চার্লস্ পবিত্র রোমান সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। স্পেন বরাবরই ক্যাথলিকদের নেতৃত্ব দানে অগ্রণী ভূমিকা লইয়াছিল। এক্ষণে ট্রেন্টের ধর্মীয় সভায় প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় আমন্ত্রণ পাইয়াও উহাতে যোগদান না করায় চার্লস্ ক্রুদ্ধ হইলেন। স্বভাবতঃই তিনি বলপূর্বক জার্মানীর প্রোটেস্টাণ্টদের দমন করিতে অগ্রসর হন। এ-দিকে প্রোটেস্টাণ্ট রাজ্যসমূহ ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য বিপদ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে স্মলক্যাল্ডিক (১৫৩০ খ্রীঃ) নামে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।


পঞ্চম চালস্

ধর্মযুদ্ধের প্রথম দিকে চার্লস্ জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি মুলবার্গের যুদ্ধে স্যাক্সনির ইলেক্টরকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন। প্রোটেস্টাণ্টদের এই পরাজয়ের মূল কারণ ছিল স্যাক্সনির ইলেক্টরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মরিসের বিশ্বাসঘাতকতা। যুদ্ধে জয়ী হইয়া চার্লস্ মরিসকে স্যাক্সনির ইলেক্টর করেন। এ-ছাড়া, তিনি জার্মানীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অগস্‌বার্গের ইণ্টারিম নামক এক

আপস-বিধি প্রণয়ন করেন, ইহাতে প্রোটেস্টান্টদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহা দ্বারা কোন স্থায়ী সমাধান হইল না। কারণ, যুদ্ধের সময় স্পেনীয় সেনাবাহিনী জার্মানীর উপর নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিল এবং চার্লস্ অগস্‌বার্গের ইন্টারিম ঘোষণার পরও জার্মানীতে সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। ফলে শীঘ্রই আবার যুদ্ধের সূচনা হইল। ইতিমধ্যে মরিস চার্লসের ঘোর শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন এবং এই সুযোগে তিনি জার্মানীর প্রোটেস্টান্টদের নেতৃত্ব দেন। তিনি চার্লসের চিরশত্রু ফরাসীরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন এবং জার্মানীর প্রোটেস্টান্ট রাজন্যবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ফলে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দের এক যুদ্ধে চার্লস্ পরাজিত হইয়া ইতালিতে পলায়ন করেন।

মরিসের নেতৃত্বে চার্লসের পরাজয়

অতঃপর তিনি জার্মানীর প্রোটেস্টান্টদের দমনের সমস্ত আশা ত্যাগ করিলেন। ফলে চার্লসের ভ্রাতা ফার্ডিন্যাণ্ড মরিসের সহিত এক আপস-মীমাংসায় উপনীত হন। চার্লস্ জার্মানীর সমস্ত দায়দায়িত্ব ভ্রাতা ফার্ডিন্যাণ্ডের উপর অর্পণ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। পরিশেষে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অগস্‌বার্গ-এর সন্ধি দ্বারা জার্মানীর ধর্ম-বিরোধ সাময়িকভাবে প্রশমিত হইল।

অগস্‌বার্গের সন্ধি

(ঘ) সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ ও নেদারল্যাণ্ড

সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ স্পেনের সিংহাসনে তাঁহার পুত্র ফিলিপকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ফিলিপ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার শাসনকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেদারল্যাণ্ড-এর বিদ্রোহ।

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম এই দুই রাজ্যকে সম্মিলিতভাবে বলা হইত নেদারল্যাণ্ড। হল্যাণ্ডে ইতিপূর্বেই প্রোটেস্টান্ট ধর্ম প্রসারিত হইয়াছিল, কিন্তু বেলজিয়ামে ক্যাথলিক ধর্মই বহাল ছিল। যাজকদের বিচারসভা স্থাপন করিয়া সম্রাট চার্লসের আমলেই নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্টান্টদের দমন ও নির্যাতন ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল। দ্বিতীয় ফিলিপের সময় এই নির্যাতন আরও তীব্র হইয়াছিল। ফলে, যাজকদের বিচারালয়ের বিচারে বহু

ফিলিপের দমন-নীতি—যাজকদের বিচারালয় ও বর্ধিত কর

লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এ-ছাড়া, নেদারল্যাণ্ডের প্রশাসনিক কাঠামোর রদবদল করা হইয়াছিল। শাসন-ব্যাপারে স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর কোন স্থান ছিল না। স্পেনরাজের এক প্রতিনিধি দ্বারাই শাসনকার্য পরিচালিত হইত।



দ্বিতীয় ফিলিপ

ফিলিপ প্রজাদের উপর অত্যধিক কর স্থাপন করিয়া নেদারল্যাণ্ড হইতে গৃহীত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এ-ছাড়া, তিনি প্রোটেস্টান্ট বণিক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়করও বর্ধিত করিয়াছিলেন।

এই সময় ফিলিপের প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমে নেদারল্যাণ্ড শাসন করিতেন মার্গারেট অব্ পার্মা। তাঁহার শাসনকালে বিক্ষুব্ধ নেদারল্যাণ্ড-বাসিগণ সংঘবদ্ধ হইয়া আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে শাসন-সম্পর্কিত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার দাবি করে। তাহারা, বিশেষতঃ যাজকদের বিচারালয়ের অবসান চাহিয়াছিল। কিন্তু এইভাবে কোন প্রতিকার না হইলে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডে এক জাতীয় অভ্যুত্থান হয়। এমতাবস্থায় বিদ্রোহীদের শাস্তি দিবার জন্য ফিলিপ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্গারেটের স্থলে ডিউক অব্ আলভাকে নেদারল্যাণ্ডের শাসকরূপে প্রেরণ করেন।

নেদারল্যাণ্ড-বাসীদের আবেদন-নিবেদন

আলভা ছিলেন একজন বিখ্যাত সেনাপতি। তিনি নেদারল্যাণ্ডে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইহাতে আট হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হয় এবং ত্রিশ হাজার লোকের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং লক্ষাধিক লোক দেশত্যাগ করে। এ-ছাড়া, আলভা শতকরা দশ পেনি হিসাবে বিক্রয়-কর প্রবর্তন করিয়া নেদারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট উভয় সম্প্রদায়ের বণিকদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ইহার ফলে বিদ্রোহ ক্রমশঃ সমগ্র নেদারল্যাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা উইলিয়ম

আলভার শাসন ও উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

অব্ অরেঞ্জ আলভার কোপ হইতে নিস্তার পাইবার উদ্দেশ্যে নেদারল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া জার্মানীতে পলাইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলে বিদ্রোহে স্বভাবতঃই তীব্রতা সঞ্চার হইল।

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলভাকে অপসারণ করা হইল এবং ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডের ব্যাপারে আরও দমনমূলক নীতি গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহের এই পর্যায়ে স্পেনীয় সৈন্যবাহিনী নেদারল্যাণ্ডে ভয়াবহ লুঠতরাজ ও তাণ্ডব চালাইয়াছিল। এই সময় নেদারল্যাণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণের প্রদেশগুলি এক চুক্তির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল এবং দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ বেলজিয়ামের ক্যাথলিকগণ স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিল না।

বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভেদ

১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলের প্রোটেস্টাণ্ট প্রদেশগুলি ইউট্রেক্টের সংযুক্তি গঠন করিয়া যুদ্ধ চালাইবার প্রস্তাব ঘোষণা করিল। ফিলিপ স্বভাবতঃই উদ্ধত হল্যাণ্ডকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া দমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জের নেতৃত্বে বিদ্রোহিগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে থাকে। ক্রমে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জার্মানীর প্রোটেস্টাণ্টগণ বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। ইংলণ্ড প্রকাশ্যে যুদ্ধ জাহাজ, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া হল্যাণ্ডবাসীদের স্পেনের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিতে থাকে। এই সময় উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ জনৈক ধর্মান্ধ ক্যাথলিক আততায়ীর হস্তে নিহত হন। কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহ প্রশমিত হইল না। অতঃপর দ্বিতীয় ফিলিপের মৃত্যু হইলে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের সহিত বারো বৎসরের জন্য এক সন্ধি হইল। ইহার ফলে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছিল, যদিও আইনত

হল্যাণ্ডের নেতৃত্বে উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ



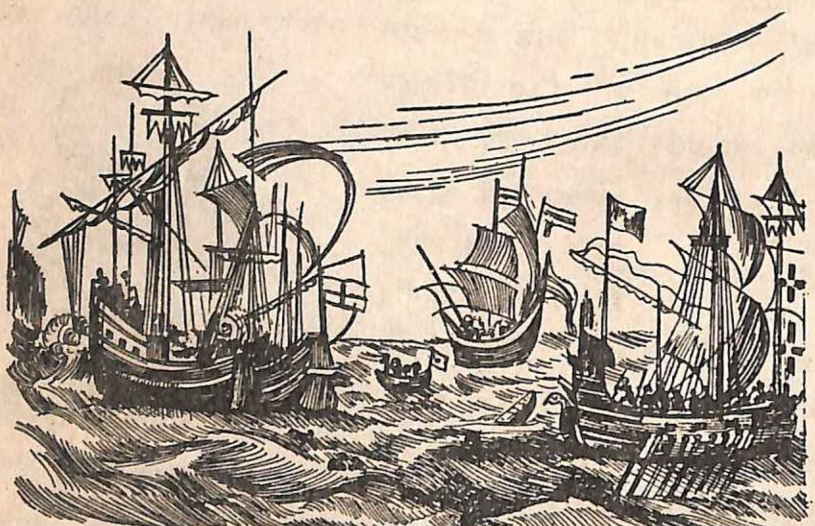
উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ

১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি দ্বারাই হল্যাণ্ড স্বাধীন হইয়াছিল।

দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ড অর্থাৎ বেলজিয়াম ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের অধীন ছিল, অতঃপর উহা অস্ট্রিয়ার অধীন হয়।

(ঙ) দ্বিতীয় ফিলিপ ও এলিজাবেথ

সূচনা : স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথকে পছন্দ করিতেন না। কারণ, ফিলিপ ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক এবং এলিজাবেথ স্বয়ং ধর্মীয় ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলেও ইংলণ্ডে প্রোটেস্টান্টদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এ-দিকে ফিলিপ ছিলেন ক্যাথলিক-দের সংস্কার-আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা এবং ঐ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের সর্বত্র ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এমতাবস্থায় ফিলিপ স্বভাবতঃই ইংলণ্ড ও উহার চার্চকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের জন্য



অজেয় আর্মাডা

ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এ-ছাড়া, ফিলিপ হল্যাণ্ডের প্রোটেস্টান্টদের দমন করিতে চাহিলে ইংলণ্ড বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল। এই সকল কারণে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন ফিলিপ ইংলণ্ডের

বিরুদ্ধে এক বিশাল নৌবহর প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৫৮৮ খ্রীঃ), যাহা ইতিহাসে 'অজেয় আর্মাডা' নামে খ্যাত। এই নৌবহরে ১৩০টি জাহাজ, ৮,০০০ নাবিক এবং ১৯,০০০ সৈন্য ছিল। কিন্তু এই বিশাল নৌবহর ইংলিশ চ্যানেলে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের অসমসাহসী নাবিকগণ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং ক্রমশঃ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। এ-ছাড়া, ব্রিটিশ রণতরীসমূহের ক্ষিপ্রতা ও ড্রেক, হোয়ার্ড প্রভৃতি নাবিকদের রণকৌশল স্পেনীয় নৌবহরকে খুব সহজেই বিধ্বস্ত করিল। অতঃপর অবশিষ্ট স্পেনীয় রণতরী স্কটল্যাণ্ডের পথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় সামুদ্রিক ঝড়ে পড়িয়া বিনষ্ট হইল। ফলে ফিলিপের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. নবজাগরণের প্রভাবে চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারের প্রতি জনমানসে সন্দেহের উদ্রেক। যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্নীতি, বিলাস ও অনাচার।

২. চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথমে ইংলণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় যথাক্রমে ওয়াইক্লিফ্ ও হাসের চেষ্টায় জনমত গঠন। পরে মার্টিন লুথারের প্রতিবাদ এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে জার্মানী এবং ক্রমে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ধর্মসংস্কার আন্দোলন।

৩. লুথারের নেতৃত্বে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের স্থলে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের উত্থান। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে নূতন ধর্মের বিস্তার।

৪. সংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চকে দীর্ঘায়ু করিবার নিমিত্ত নানান ধরণের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। যাজকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন, দমনমূলক নীতি, যাজকদের বিচার সভা। জেসুইট্ সোসাইটি—প্রতিষ্ঠাতা লোয়েলা এবং প্রচারক ফ্রান্সিস জেভিয়ারের কর্মকাণ্ড। ট্রেণ্টের ধর্মীয় সভা—পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

৫. পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ—স্পেনরাজ পঞ্চম চার্লস্ ও প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে সংঘর্ষ—প্রথমদিকে জয়ী হইলেও পরিণামে চার্লসের পরাজয়—প্রোটেস্টাণ্টদের দমনের আশা পরিত্যাগ।

৬. নেদারল্যাণ্ডে দ্বিতীয় ফিলিপের দমননীতি, পরিণামে নেদারল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল তথা হল্যাণ্ডের বিদ্রোহ—উইলিয়ম অব অরেঞ্জের নেতৃত্ব—১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে

হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয় ফিলিপ কর্তৃক ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের বিরুদ্ধে যুদ্ধজাহাজ (আর্মাডা নৌবহর) প্রেরণ। স্পেনের পরাজয় ও মর্যাদাহানি।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। কি কারণে ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা দিয়াছিল ? এই প্রসঙ্গে জন ওয়াইক্লিফ্ ও জন হাসের ভূমিকা আলোচনা কর। ২। মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৩। কিভাবে আত্মশুদ্ধি ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চ সংস্কার ও সংহতির চেষ্টা করিয়াছিল তাহা বর্ণনা কর। ৪। ক্যাথলিক চার্চের সংহতির প্রয়োজনে জেস্যুইট সোসাইটির কার্যকলাপ আলোচনা কর। ৫। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে কিভাবে ধর্ম-যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল ? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ? ৬। কি কারণে সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সহিত নেদারল্যাণ্ডের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(১) কিভাবে ইংলণ্ডে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম প্রসারিত হইয়াছিল ? (২) কোন্ বৎসর এবং কাহাদের মধ্যে অগস্‌বার্গের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ? (৩) কি কারণে দ্বিতীয় ফিলিপের সহিত ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল ?

বিষয়মুখী ঃ

এক কথায় উত্তর দাও ঃ (ক) লুথার কোথায় তাঁহার ইস্তাহার টাঙাইয়া দিয়াছিলেন ? (খ) স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রসারে কে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন ? (গ) ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার্স কে ছিলেন ? (ঘ) কাহার কঠোর নির্যাতনের ফলে উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ নেদারল্যাণ্ড হইতে সাময়িকভাবে পলাইয়া গিয়াছিলেন ? (ঙ) 'অজেয় আর্মাডা' কে প্রেরণ করিয়াছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) চতুর্দশ শতাব্দীতে — নামে অক্সফোর্ডের এক অধ্যাপক ধর্মীয় আচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (২) পাপক্ষয়ের নিমিত্ত — বিক্রয় করা হইত। (৩) মার্টিন লুথার — গীর্জার দরজায় — বিরুদ্ধে — টি যুক্তি সংবলিত ইস্তাহার টাঙাইয়া দিয়াদিলেন। (-) ইংলণ্ডের রাজা — বিবাহ বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করিয়া

পোপের সহিত বিরোধের সূচনা হয়। (৫) ক্যাথলিক গীর্জার সংস্কারের ক্ষেত্রে পোপ — নাম উল্লেখ্য। (৬) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে — হত্যা করা হইত। (৭) জেসুইট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসে — নামে প্রসিদ্ধ। (৮) সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা হইল — -এর বিদ্রোহ। (৯) নেদারল্যাণ্ডে ফিলিপের প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন —। (১০) ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে — সন্ধি দ্বারা হল্যাণ্ড স্বাধীন হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও:

(১) সংস্কার আন্দোলন বলিতে কি বুঝ? (২) জন হাস কোথাকার লোক ছিলেন? (৩) কোন্ গীর্জা সংস্কারের জন্য 'পাপক্ষয় পত্র' বিক্রয় করা হইত? (৪) ইংলণ্ডের রাজার সহিত পোপের বিরোধের কারণ কি ছিল? (৫) কি কারণে জেসুইট সোসাইট প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল? (৬) ট্রেন্টের ধর্মীয় সভায় কাহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল? (৭) কোন্ রাজা আর্মাডা প্রেরণ করিয়াছিলেন?

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব

সূচনা ঃ ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের মৃত্যু হইলে ইংলণ্ডে টিউডর বংশের রাজত্বকালের অবসান হইল। পরবর্তী উত্তরাধিকারী ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেম্‌স্, যিনি প্রথম জেম্‌স্ নাম লইয়া ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। জেম্‌স্ ছিলেন স্টুয়ার্ট বংশের সন্তান। ফলে জেম্‌সের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

জেম্‌সের সিংহাসনে আরোহণ

স্টুয়ার্ট যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল রাজশক্তির সহিত প্রতিনিধি পরিষদ বা পার্লামেন্টের বারংবার বিরোধ যাহার ফলে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। পরিণামে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজার পরাজয় ও প্রাণহানি হইয়াছিল।

পার্লামেন্টের সহিত বিরোধ

রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ ঃ রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উভয়ের মধ্যে আদর্শগত অনৈক্য। স্টুয়ার্ট রাজারা বলিতেন যে, রাজা ঈশ্বরের নিকট হইতে আপন অধিকার লাভ করিয়াছেন। সুতরাং প্রজাদের নিকট তিনি জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। প্রজারা রাজার ক্ষমতা প্রতিরোধ বা সংকোচ করিতে পারে না। কিন্তু পার্লামেন্ট রাজার 'ঈশ্বরদত্ত অধিকার' অস্বীকার করিল।

আদর্শগত অনৈক্য —'ঈশ্বরদত্ত অধিকার'

স্টুয়ার্ট যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিও ছিল পার্লামেন্টের সহিত রাজার বিরোধের অন্যতম কারণ। টিউডর আমলে অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশংকাহেতু জনগণ রাজার স্বেচ্ছাচারিতা মানিয়া লইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও টিউডর রাজত্বের শেষ দিকে, বিশেষতঃ স্পেনীয় আর্মাডার পরাজয়ের

পরিবর্তিত পরিস্থিতি

পর পার্লামেণ্ট ক্রমশঃ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে থাকে। স্বভাবতঃই স্টুয়ার্ট আমলে বহিরাক্রমণের ভীতি কমিয়া আসিলে এবং অভ্যন্তরীণ শৃংখলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পার্লামেণ্ট আর রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বরদাস্ত করিল না।

স্টুয়ার্ট রাজগণের স্বেচ্ছাচারিতা

এইরূপ পরিস্থিতিতে পার্লামেণ্ট শক্তিলাভের জন্য ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল অথচ স্টুয়ার্ট রাজগণ তাহাদের আমল দিতে চাহিলেন না। তাঁহারা পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে নূতন নূতন কর ধার্য করিতেন, টাকা লইয়া উপাধি বিক্রয় করিতেন ও বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দান করিতেন।

তাঁবেদার আদালতের সাহায্যে বিচারের নামে অত্যাচার

ইংলণ্ডে নিয়ম ছিল যে, উচিত মত বিচার না করিয়া কাহাকেও সাজা দেওয়া চলিবে না। কিন্তু স্টার চেম্বার ও হাই কমিশন কোর্ট নামে রাজার দুইটি তাঁবেদার আদালতের সাহায্যে লোকের প্রতি অন্যায় বিচার করা হইত এবং অন্যায়ভাবে কঠোর সাজা দেওয়া হইত।

ধর্মীয় বিরোধ

ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই ছিল প্রোটেস্টাণ্ট। ইহারা ছিল গোঁড়া খ্রীষ্টান এবং এই গোঁড়ামির জন্য তাহাদের পিউরিটান বলা হইত। এ-দিকে স্টুয়ার্ট রাজগণ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। স্বভাবতঃই তাঁহারা প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের অগ্রগতির প্রতি অনুকূল ছিলেন না।



প্রথম চার্লস্

রাজা প্রথম জেম্‌সের সময়েই পার্লামেণ্টের সহিত বিরোধের সূচনা হয়। কিন্তু জেম্‌স্ সরাসরি সংঘর্ষ এড়াইতে সমর্থ হন। জেম্‌সের পুত্র চার্লসের সময় রাজার পরামর্শদাতা মন্ত্রীদের কার্যকলাপ, পররাষ্ট্রনীতি, জোর করিয়া অর্থ আদায় এবং সর্বোপরি ধর্মীয় বিষয় লইয়া পার্লামেণ্টের সহিত বিরোধ চরমে উঠিয়াছিল। যুদ্ধ ব্যতীত এই বিরোধের কোন আপসজনক সমাধান সম্ভব হইল না।

গৃহযুদ্ধ (১৬৪২—'৪৯ খ্রীঃ) : সাত বৎসর কাল রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল। রাজার ধনবল ছিল না, কিন্তু ভূম্যধিকারীদের বেশির ভাগ তাঁহার পক্ষে ছিল। রাজার দলভুক্ত সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া লড়াই করিতেন বলিয়া ইঁহাদের নাম হইল 'ক্যাভেলিয়ার' বা 'সওয়ার'। রাজার বিপক্ষদলের পিউরিটান্‌গণ ছোট করিয়া চুল ছাঁটিত বলিয়া রাজার দল ঠাট্টা করিয়া তাহাদের নাম দিয়াছিল 'রাউণ্ড হেড' বা 'গোলমাথা'।

রাজার দল—'ক্যাভেলিয়ার' এবং বিপক্ষ দল 'রাউণ্ড হেড'



ক্যাভেলিয়ার

যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর রাজার পক্ষেরই জয় হইতে লাগিল। কিন্তু ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাজার পরাজয়ের পালা শুরু হইল। অলিভার ক্রমওয়েল নামক হান্টিংডন-শায়ারের এক ভদ্রলোক গড়িয়া-পিটিয়া এমন একদল সৈন্য খাড়া করিলেন যে, রণস্থলে তাহাদের গতি-রোধ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। এই সুদক্ষ সেনাপতির রণকৌশলে পার্লামেণ্টপক্ষীয় সৈন্যগণ রাজার সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিল।

অলিভার ক্রম-ওয়েলের নেতৃত্বে রাজার সৈন্য-দলের পরাজয়



রাউণ্ড হেড

পর পর দুইটি যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া চার্লস্ আত্মসমর্পণ করিলেন। স্থির হইল যে, রাজার বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিতে হইবে। বিচারে রাজা দোষী সাব্যস্ত হইলেন এবং ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল।

ক্রমওয়েল ও কমনওয়েলথ : রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের অবসান হইল। পার্লামেণ্টের অন্যতম অঙ্গ হাউস অব্ লর্ডস্ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অবস্থায় প্রথমে পার্লামেণ্টের অবশিষ্ট ষাটজন সদস্যের উপর দেশের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েল বলপূর্বক পার্লামেণ্টের এই ভগ্নাবশেষকে ভাঙিয়া দেন। নূতন সংবিধান অনুযায়ী ক্রমওয়েল হইলেন 'লর্ড প্রটেক্টর'। কার্যত তখন হইতে তিনিই ছিলেন ইংলণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্তা। ক্রমওয়েল প্রবর্তিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই কমনওয়েলথ নামে অভিহিত।



ক্রমওয়েল

তাঁহার শাসনকালে ক্রমওয়েল বারংবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু নানা কারণে পার্লামেণ্টের সহিত তাঁহার বনিত না। তিনি যত শীঘ্র পারিতেন উহা ভাঙ্গিয়া দিতেন এবং শেষে পার্লামেণ্ট না ডাকিয়া তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষগণের সাহায্যে শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হইল।

স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল শাসনকর্তার পদ লাভ করিলেন; কিন্তু চারিদিকে গোলমাল দেখিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রাজকার্য হইতে অব্যাহতি লইলেন।

দেশে অরাজকতা

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া দেশে একরূপ অরাজকতা চলিল। এই সময়ে মৃত রাজার পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্ হল্যাণ্ডে বাস করিতেছিলেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে এক মহাসভা সমবেত হইয়া আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে স্থির করিয়া চার্লস্‌কে

আমন্ত্রণ করিলেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে দ্বিতীয় চার্লস্ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। বিপুল আনন্দ ও উৎসাহের সহিত দেশের লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। সুতরাং এগার বৎসর পরে ইংলণ্ডে আবার রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লব—কারণ ঃ ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্স্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিপূর্বে চার্লসের রাজত্বকালে টেস্ট অ্যাক্ট্ বিধিবদ্ধ হয়। ঐ আইন অনুযায়ী স্থির হইয়াছিল যে, সরকারী পদপ্রার্থীকে শপথপূর্বক অঙ্গীকার করিতে হইবে, তিনি ইংলণ্ডের উপাসনা-পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিবেন। কিন্তু রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে জেম্স্ প্রকাশ্যে টেস্ট অ্যাক্টের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া রোমান ক্যাথলিকদের দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে রাজা ঘোষণা করিলেন যে, রোমান ক্যাথলিক বা ডিসেণ্টারদের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত দমনমূলক প্রচলিত রীতি আছে, তাহা বর্তমানে স্থগিত রহিল।

ক্যাথলিক প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জেম্স্ এই ঘোষণা পুনঃপ্রচার করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক উপাসনাগৃহে যাজকদিগকে ঐ আদেশ পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে। ক্যাণ্টারবেরির প্রধান বিশপ প্রমুখ সাতজন বিশপ এই আদেশের বিরুদ্ধে জেম্সের নিকট আবেদন করিলেন। রাজাজ্ঞা অমান্যের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহারা অভিযুক্ত হইলেন, কিন্তু আদালতের বিচারে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন। যেদিন তাঁহাদের মুক্তিলাভ হইল সেইদিনই ইংলণ্ডের সাতজন প্রধান ব্যক্তি হল্যাণ্ড হইতে উইলিয়মকে এই বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন সসৈন্যে আগমনপূর্বক জেম্সকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করেন।

সাতজন বিশপের বিচার

ঠিক এই সময়ে এইরূপ আহ্বান করিবার বিশেষ একটি কারণ ঘটিয়াছিল। এতদিন পর্যন্ত জেম্সের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই; প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার দুইটি কন্যা হইয়াছিল। প্রথমা কন্যার নাম মেরী এবং দ্বিতীয়ার নাম অ্যান;

দুইজনেই প্রোটেস্টাণ্ট। মেরীর বিবাহ হইয়াছিল হল্যাণ্ডের রাজা উইলিয়মের সহিত। লোকে মনে করিয়াছিল যে, জেম্‌সের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রোটেস্টাণ্ট কন্যাদের মধ্যে একজন সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তখন বিপদের কোন আশংকা থাকিবে না। কিন্তু এই সময়ে জেম্‌সের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। স্বভাবতঃই ইংলণ্ডবাসীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। কারণ, নবজাত শিশু নিশ্চয় ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হইয়া পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে—এই ভাবিয়া লোকে আর স্থির থাকিতে পারিল না।

জেম্‌সের পুত্রলাভ প্রোটেস্টাণ্টদের হতাশা

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর উইলিয়ম ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। জেম্‌স্ বিপদ বুঝিয়া ফ্রান্সে পলায়ন করিলেন। এইবার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য এক মহাসভা আহূত হইল। এই মহাসভা স্থির করিল যে, শূন্য সিংহাসনে উইলিয়ম ও মেরী একত্রে মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। বিনা রক্তপাতে এত বড় একটি পরিবর্তন সাধিত হইল বলিয়া ইহা '১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লব' বলিয়া কীর্তিত হয়। এতদিন ধরিয়া রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে যে-বিরোধ চলিতেছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল এবং প্রমাণিত হইল যে, পার্লামেণ্টই দেশের শাসনকর্তা।

জেম্‌সের পলায়ন

গৌরবময় বিপ্লব

বিল অব্ রাইট্‌স্ (১৬৮৯) এবং অন্যান্য ফলাফল : ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট বিল অব্ রাইট্‌স্ নামে একটি অতি-প্রয়োজনীয় আইন পাস করাইয়া লইল। ইহার দ্বারা রাজা ও পার্লামেণ্ট এই উভয়ের শক্তি ও ক্ষমতার সীমা নির্ধারিত হইয়া গেল। স্থির হইল যে, অতঃপর কোন রোমান ক্যাথলিক ইংলণ্ডের রাজা হইতে পারিবেন না; ভবিষ্যতে কোন রাজা আইন মকুব করিতে বা স্থগিত রাখিতে পারিবেন না; পার্লামেণ্টের নির্বাচন ও গঠন সম্পর্কে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে কোন ট্যাক্স ধার্য করিতে পারিবেন না এবং দেশে কোন স্থায়ী সৈন্যদল রাখিতে পারিবেন না।

এই সময় হইতে ইংলণ্ডের রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করেন না ; পার্লামেণ্ট শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং পার্লামেণ্টই দেশের সর্বেসর্বা হইয়া রহিয়াছে।

রাজনৈতিক দল-ভিত্তিক সরকার গঠন

এ-ছাড়া গৌরবময় বিপ্লব ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসে অগ্রগতির সূচনা করিয়াছে। বস্তুতঃ এই বিপ্লবের পর হইতে রাজনৈতিক দল-ভিত্তিক সরকার গঠন ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-রূপে পরিগণিত হইতে থাকে। এই ধরনের সরকার ইংলণ্ডের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল এবং রাজনৈতিক জীবনের অনেক অশান্তি প্রশমিত করিয়াছিল। প্রতি-হিংসামূলক কার্যকলাপ যথা, ইমপিচ্‌মেণ্ট এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। ইংলণ্ডের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল—হুইগ এবং টোরী এই বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং উভয় দলই এই বিপ্লবের ফলে লাভবান হইয়াছিল।

সামরিক বাহিনী-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা-সংক্রান্ত আইন

টোরী দল সামরিক বাহিনী-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হওয়ায় খুশী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে হুইগ দল ইতিমধ্যেই পার্লামেণ্টে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের চেষ্টায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সংক্রান্ত আইন (The Toleration Act) বিধিবদ্ধ হয়। ইহার ফলে ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে-সকল অত্যাচার হইত তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বকালের সূচনা—রাজশক্তির সহিত প্রতিনিধি পরিষদ বা পার্লামেণ্টের বিরোধ। পার্লামেণ্ট কর্তৃক রাজার 'ঈশ্বরদত্ত অধিকার' অস্বীকার, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা, করধার্যের বিষয়ে প্রতিবাদ প্রভৃতি মূল কারণ।

২. প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে গৃহযুদ্ধ—'ক্যাভেলিয়ার' ও 'রাউণ্ডহেড'—ক্রমওয়েলের নেতৃত্ব, রাজশক্তির পরাজয়—রাজা চার্লসের শিরশ্ছেদ।

৩. ক্রমওয়েল কর্তৃক দেশ শাসন—নূতন সংবিধান প্রবর্তন, 'কমনওয়েলথ' প্রতিষ্ঠা।

৪. ক্রমওয়েলের মৃত্যু, অরাজকতা এবং পরিশেষে স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৫. রাজা দ্বিতীয় জেমসের শাসনকাল, ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম প্রবর্তনের প্রচেষ্টা—জেমস্ নির্দেশিত ধর্মীয় আদেশ পাঠে যাজকদের বিরোধিতা এবং পরিশেষে জেমসের পুত্র সন্তানের জন্ম প্রভৃতি কারণে জেমসের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

৬. গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮ খ্রীঃ) মাধ্যমে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিল অব্ রাইট্স্ বিধিবদ্ধকরণ। গৌরবময় বিপ্লবের অন্যান্য ফলাফল।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। স্টুয়ার্ট যুগে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের মূল কারণগুলি বর্ণনা কর। ২। পার্লামেন্টপক্ষীয় সৈন্যদল কাহার নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল ? ক্রমওয়েলের রাজ্যশাসন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৩। গৌরবময় বিপ্লবের কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৪। গৌরবময় বিপ্লবের ফলশ্রুতি কি হইয়াছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) কি কারণে স্টুয়ার্ট যুগে ইংলণ্ডের জনগণ রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বরদাস্ত করে নাই। (২) কিভাবে ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ? (৩) কি কারণে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবকে 'গৌরবময় বিপ্লব' নাম দেওয়া হইয়াছিল ? (৪) বিল অব্ রাইটস-এ কি কি বিধিব্যবস্থা ছিল ? (৫) 'সাতজন বিশপের বিচার' সম্পর্কে কি জান ?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও : (ক) স্টুয়ার্ট বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি ? (খ) কাহার রাজত্বকালে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ? (গ) অলিভার ক্রমওয়েল প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা কি নামে অভিহিত হইত ? (ঘ) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্টুয়ার্ট রাজের কি নাম ছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) রাজা — সময়ে ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের সহিত বিরোধের সূচনা হয়। (২) রাজা — রাজত্বকালে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল। (৩) গৃহযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে — বংশের রাজগণ রাজত্ব করিতেন। (৪) রাজার বিপক্ষদলের সৈন্যদের নাম দেওয়া হইয়াছিল —। (৫) নূতন সংবিধান অনুযায়ী ক্রমওয়েল — উপাধি পাইলেন। (৬) ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্ট — নামে একটি আইন পাশ করে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) প্রথম জেমস কাহার মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহন করেন? (২) কাহাদের পিউরিটান বলা হইত? (৩) কাহাদের সৈন্য ক্যাভেলিয়ার নামে পরিচিত ছিল? গৃহযুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়ী হইয়াছিল? (৫) কত বৎসর পর ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতবর্ষ

(ক) মুঘল সাম্রাজ্য : প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (১৫২৬-১৭০৭) : ইউরোপে যখন নবজাগরণ ও ধর্ম-সংস্কারের যুগ চলিতেছিল তখন ভারতে মুঘলরা একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন আকবর; কিন্তু ভারতে মুঘল শাসনের সূচনা করেন বাবর। বাবর বিখ্যাত মোঙ্গলবীর চেঙ্গিজ খাঁ ও তাইমুরের বংশধর। মধ্য এশিয়ার ফরগণা প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাবুল অধিকার করেন।

বাবরের ভারত আক্রমণকালে দিল্লীর সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধচিত্ত ও ভীরু-প্রকৃতি ইব্রাহিম সকলকেই সন্দেহ করিতেন, সকলকেই ভয় করিতেন এবং সকলের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন। ফলে রাজ্যের সমস্ত আফগান সর্দারগণ সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সুতরাং ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী এবং ইব্রাহিমের পিতৃব্য আলম খাঁ বাবরের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং তাঁহাকে ভারত

বাবরের ভারত আক্রমণের সুযোগ—লাহোর অধিকার



বাবর

আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান জানান। এই সুযোগে বাবর লাহোর জয় করিয়া লইলেন। তখন দৌলত খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ—দিল্লী ও আগ্রা অধিকার

এমতাবস্থায় বাবর পাঞ্জাব দখল (১৫২৫ খ্রীঃ) করিয়া দৌলত খাঁকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন। তারপর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের রণক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলেও ইহা ভারতে পরাক্রান্ত মুঘলদের আবির্ভাব সূচিত করিল।

আফগান সর্দারদের দমন

পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর আফগান সর্দারদের দমন করিতে চাহিলেন। পাটনার উত্তরে গঙ্গা ও গর্গরা নদীর সঙ্গমস্থলে যুদ্ধে আফগানগণ একজোট হইয়াও পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হইল। ইহার ফলে জৌনপুর, কাল্পি, ঢোলপুর, বিয়ানা ও গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে বাবরের আধিপত্য বিস্তৃত হইল।

রাজপুতদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা—রাণা সংগ্রাম সিংহের পরাজয়

এইবার বাবর রাজপুত শক্তির সম্মুখীন হইলেন। তৎকালীন রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ। বাবরকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তিনি ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহ্‌মুদ লোদী এবং মেওয়াটের আফগান নায়ক হাসান খাঁ প্রভৃতি মুসলমানদের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি রাজপুত শক্তিকে একত্রিত করিয়া বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ফলে ফতেপুর সিক্রির নিকট খানুয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল (১৫২৭ খ্রীঃ)। যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহের পরাজয় হইল। অতঃপর বাবর সংগ্রাম সিংহের প্রধান অনুগামী মেদিনী রায়ের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত চান্দেরী দুর্গ অধিকার করেন (জানুয়ারী, ১৫২৮ খ্রীঃ)। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়।

বাবর রাজ্য জয় করিয়া ভারতে মুঘল রাজত্বের সূচনা করেন, কিন্তু

শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনিও রাজ্যে শাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে আফগানবীর শের শাহের নিকট পরাস্ত হইয়া তিনি রাজ্য ছাড়িয়া পারস্যে পলায়ন করেন। শের শাহ্ ১৫৪০ হইতে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর তাঁহার মৃত্যু হইলে আফগানদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সুযোগে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন আবার দিল্লীরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

হুমায়ুনের পরাজয়

আকবর ঃ হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আকবরকে প্রথম হইতেই যুদ্ধ করিয়া রাজ্য জয় করিতে হইয়াছিল। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর আফগানদের সেনাপতি হিমুকে পরাস্ত করেন। ইহার চারিবৎসর পরে আকবর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি মালব ও গণ্ডোয়ানা জয় করিলেন। এইবার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল রাজস্থানের উপর। আকবর সন্ধি ও বিবাহবন্ধন দ্বারা একে একে রাজপুত রাজাদিগকে বশীভূত করিলেন। তাঁহার উদার নীতির ফলে অম্বর, বিকানীর, জয়সলমীর,

রাজ্যজয়

রাজপুতদের সহিত মিত্রতা নীতি



আকবর

যোধপুর ও অন্যান্য রাজ্যের রাজাগণ মুঘলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কেবল মেবারের রাণা উদয়সিংহ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন না।

উদয়সিংহ ছিলেন বিখ্যাত রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র, কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় সাহসী ছিলেন না। আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করিলে উদয়সিংহ ভয়ে চিতোর ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। ক্রমে চিতোর আকবরের অধিকারভুক্ত হইল।

চিতোর অধিকারভুক্ত হইলেও রাজপুতানার কতিপয় সামন্ত কিন্তু তখনও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাঁহাদের অগ্রণী ও নেতা ছিলেন উদয়সিংহের পুত্র প্রতাপসিংহ। আকবরের তুলনায় প্রতাপের সৈন্যবল বা ধনবল কিছুই ছিল না। তথাপি তিনি আকবরের কাছে মাথা নত করিলেন না। পরিশেষে প্রতাপ হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং আহত অবস্থায় পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করেন। মুঘলবাহিনী একে একে প্রতাপের দুর্গগুলি দখল করিয়া লইল। প্রতাপ মৃত্যুর পূর্বে স্বদেশের প্রায় অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু চিতোর উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

রাণা প্রতাপ



রাণা প্রতাপ

রাজস্থান অধিকারের পর আকবর গুজরাট ও বঙ্গদেশ জয় করেন। কাবুল, কাশ্মীর, উড়িষ্যা, সিন্ধুপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তান ও কান্দাহার একে একে আকবরের অধিকারে আসিল। এইরূপে উত্তর ভারতে মুঘল আধিপত্য স্থাপিত হইল। দাক্ষিণাত্যের আহ্‌মদ-নগর রাজ্যের কতক অংশ ও খান্দেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ফলে আকবরের সাম্রাজ্য কান্দাহার হইতে বঙ্গোপসাগর এবং হিন্দুকুশ পর্বত হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত প্রসারিত হইল।

অন্যান্য রাজ্য—আকবরের সাম্রাজ্য সীমা

আকবর শুধু রাজ্য জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বিশাল সাম্রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর ও শাহ্ জাহান ঃ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর মুঘলসম্রাট হন। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আফগান বিদ্রোহের অবসান হয় এবং মেবারের রাণা অমর সিংহ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

এ-ছাড়া জাহাঙ্গীরের আমলে আহ্ মদনগরের সহিতও দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। শেষে আহ্ মদনগরের সুযোগ্য মন্ত্রী মালিক অম্বরের সহিত মুঘলদের সন্ধি হইলে এই যুদ্ধের অবসান হইল। ইহার ফলে আহ্ মদনগরের এক অংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এ-ছাড়া, পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বে কাঙ্গড়া দুর্গেও এই সময় মুঘলদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে কান্দাহার মুঘলদের হস্তচ্যুত হয়।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শাহ্ জাহান সিংহাসন লাভ করেন।

শাহ্ জাহান

তাঁহার সময় দাক্ষিণাত্যের আহ্ মদনগর রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তিনি কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।

ঔরঙ্গজেব ঃ শাহ্ জাহানের পুত্র ঔরঙ্গজেব পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করেন।

রাজত্বের শুরুতেই ঔরঙ্গজেব রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১৬৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকৃত হয়। ইতিপূর্বে তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই দক্ষিণ-ভারতে মারাঠা নেতা

শিবাজীর সহিত সংঘর্ষ

শিবাজী শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ক্রমে শিবাজী মুঘল রাজ্যে লুটপাট আরম্ভ করিলে ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করিবার জন্য দুইজন মুঘল সেনাপতি



ঔরঙ্গজেব

প্রেরণ করেন। শিবাজী পরাজিত হইয়া সন্ধি করেন এবং তাঁহার অধিকৃত দুর্গসমূহের মধ্যে অনেকগুলি মুঘলদের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু ইহাতে শিবাজীর শক্তি খর্ব হয় নাই এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি হৃতরাজ্যের অধিকাংশই পুনরধিকার করেন।

ঔরঙ্গজেবের ধর্ম-সংক্রান্ত-নীতি, বিশেষতঃ হিন্দু-বিদ্বেষের ফলে উত্তর ভারতের নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। রাজস্থানে মাড়বারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তিনি যোধপুর অধিকার করেন এবং অন্যান্য কতিপয় স্থানে মুঘল অধিকার বিস্তৃত হইল। ক্রমে রাজস্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই সকল কারণে তাঁহার সময় আকবরের কীর্তি ভস্মীভূত হইল। মারাঠাদের ন্যায় শিখসম্প্রদায়ও ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

উত্তর ভারতে বিদ্রোহ—রাজস্থান

রাজত্বের শেষ ২৬ বৎসর ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যেই অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী মুঘলদের হস্তে পরাস্ত ও নিহত হইলে মারাঠা রাজধানী রায়গড় অধিকৃত হয়। ফলে কাবুল হইতে চট্টগ্রাম ও কাশ্মীর হইতে কর্ণাটক পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঔরঙ্গজেবের সময় হইতেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদনগরে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ ভারত

সামাজিক জীবন: মুঘলযুগের সমাজ ছিল কতকটা সামন্ততান্ত্রিক। রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বেসর্বা ছিলেন বাদশাহ্। তাঁহার অধীনে যে-সকল নিজাম, উজীর, ওমরাহ্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকিতেন তাঁহারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন এবং খাদ্য ও পোশাকে প্রচুর ব্যয় করিতেন। তাঁহারা প্রাসাদোপম গৃহে বাস করিতেন এবং খুবই বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। সম্ভ্রান্ত স্তরের নীচের স্তরে ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। সওদাগর, ব্যবসাদার, মহাজন, দোকানদার, চিকিৎসক, কেরানী প্রভৃতিকে লইয়া সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা

সামাজিক স্তর—সম্রাট ও আমীর-ওমরাহ্ সর্বোচ্চ শ্রেণী

আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন না, আপন আপন পদমর্যাদামত তাঁহাদের জীবনযাত্রার মান স্থিরীকৃত হইত। সওদাগর ও ব্যবসায়ীরা বিত্তশালী হইলেও সংযত জীবন যাপন করিত। দোকান-দারেরা খাওয়া-পরায় খুব কম খরচ করিত এবং টাকা পয়সা লুকাইয়া রাখিত। সাধারণ লোকের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র জীবন যাপন করিত। খাদ্যদ্রব্যের দাম সস্তা থাকায় তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত বটে, কিন্তু কাপড়-জামার একান্ত অভাব ছিল। ছুতার, রাজমিস্ত্রী ও দিনমজুরকে জমিদার ও রাজকর্মচারীদের নিকটে অর্ধেক বা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে হইত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

হিন্দু সমাজে সতীদাহ, বাল্য-বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও বরপণ প্রথা প্রচলিত ছিল। আকবর সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ছিল। হিন্দুরা মহরমের শোভাযাত্রায় যোগ দিত, মুসলমানেরাও বসন্ত ও দোল উৎসবে যোগদান করিত।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি

অর্থনৈতিক জীবন : মুঘলযুগে কৃষিই ছিল সাধারণের প্রধান জীবিকা। ধান, গম, ইক্ষু, তূলা প্রভৃতির চাষ হইত। দেশে প্রচুর শস্য হইত। দেশের শস্য দেশেই থাকিত, বাহিরে চালান যাইত না। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য খুবই সস্তা ছিল। এ-ছাড়া মুঘলযুগে তামাক চাষের প্রচলন হয় এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নীল চাষ হইত। বারুদ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় শোরা উৎপন্ন হইত।

কৃষিজাত খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য

মুঘলযুগে ভারতের শ্রম-শিল্পের, বিশেষতঃ বস্ত্র বয়ন-শিল্পের খুবই উন্নতি হইয়াছিল। সূতী ও রেশমের কাপড় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাংলার খুব সুনাম ছিল। ঢাকার মসলিন নামে খ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপের বাজারে খুব চড়া দরে বিক্রয় হইত।

বয়ন-শিল্প

মুঘলযুগের বৈদেশিক পর্যটকগণ : মুঘলযুগে অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ভারতে আসিয়া এ-দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে আকবরের আমলে রালফ্ ফিচ্, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে হকিন্স ও স্যার টমাস্ রো, শাহ্‌জাহানের আমলে

তাভার্নিয়ে এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে মানুচীর নাম বিশেষতঃ স্মরণীয়। এ-ছাড়া, আসিয়াছিলেন বার্নিয়ে নামক এক ফরাসী চিকিৎসক (১৬৫৬-৬৮ খ্রীঃ)। রো বা তাভার্নিয়ে প্রভৃতির বিবরণে গ্রাম্যজীবন ও দেশের অবস্থার অধিক বর্ণনা নাই, কিন্তু বার্নিয়ের বিবরণ হইতে দেশের প্রকৃত অবস্থা অনেকটা জানা যায়।



স্যার টমাস রো

সাম্রাজ্যের পতন (১৭০৭-১৭৫৭)ঃ ঔরঙ্গজেব ছিলেন মুঘলবংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হইয়া উঠে। কারণ সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন লইয়া ঔরঙ্গজেবের বংশধরদের মধ্যে বিরোধের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি হ্রাস পাইতেছিল। এমতাবস্থায় আমির-ওমরাহ্‌দের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, স্বদেশী ও বিদেশী-নির্বিশেষে তাহারা স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। এ-দিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ প্রদেশসমূহের শাসকগণ নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিল। ক্রমে মুঘল সম্রাটগণ যথার্থই আমির-ওমরাহ্‌দের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিল এবং দিল্লী সাম্রাজ্য ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়া উত্তর ভারতে গঙ্গার দোয়াব অঞ্চল এবং যমুনার পশ্চিমদিকের কতিপয় ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণে জাঠ এবং পশ্চিমে শিখগণ মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে থাকে। এ-ছাড়া, ১৭৮৪ হইতে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের এই সংকুচিত এলাকাতে প্রকৃতপক্ষে মারাঠাদেরই প্রাধান্য ছিল। সেই কারণে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড লেক যখন দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া মারাঠাদের দিল্লীর উপর প্রাধান্যের অবসান ঘটাইলেন, তখন হইতেই বাস্তবিকপক্ষে মুঘল শক্তি

সিংহাসন লইয়া বিরোধ—আমির-ওমরাহ্‌দের প্রাধান্য

সাম্রাজ্য সীমার সংকোচন

বলিতে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ছিলেন শেষ মুঘল সম্রাট। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় সিপাহীগণ তাঁহাকে স্বাধীন ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলে ইংরাজগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করে।

শেষ মুঘল সম্রাট

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

সূচনা: পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় নাবিকগণ সমুদ্রপথে ভারতে আসিবার রাস্তা খুঁজিতে থাকে। অবশেষে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপনীত হন। ইহার ফলে প্রথমে পর্তুগীজ এবং ক্রমে ডাচ্, ডেন, ইংরাজ ও ফরাসীগণ ভারতে আসিতে থাকে। ভারতে তাহারা প্রধানতঃ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল এবং স্বভাবতঃই সেই কারণে নানাস্থানে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়াছিল।

(১) **ইংরাজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা:** ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতে মুঘল দরবারে উত্তরাধিকার লইয়া নানা যুদ্ধবিগ্রহ, দলাদলি ও ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। সেই কারণে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলদের প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল্-মুলক (আসফজাহ্) রাজধানী দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। এই রাজ্যের নাম হায়দরাবাদ এবং আসফজাহ্ই ছিলেন হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম। এই সময় আর্কটের নবাব নামেমাত্র নিজামের অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রায় স্বাধীনভাবেই কর্ণাটপ্রদেশ শাসন করিতেন।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ কর্ণাট প্রদেশ লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রা করিল। কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি বাধা দিতে আসিয়া যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। দোস্ত আলির পুত্র সফদর আলি মারাঠাদিগকে প্রচুর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আক্রমণ নিবারণ করিলেন। মারাঠাগণ তখন দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া ত্রিচিনোপলি অবরোধ ও দখল করিল।

কর্ণাটে মারাঠা আক্রমণ

অতঃপর কর্ণাট প্রদেশে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে

সফদর আলিকে তাঁহার এক আত্মীয় হত্যা করে। পর বৎসর হায়দরাবাদের নিজাম শৃঙ্খলাস্থাপনার্থ যুদ্ধযাত্রা করিয়া মারাঠাদের হাত হইতে ত্রিচিনোপলি উদ্ধার করেন এবং আনোয়ারউদ্দিন নামক তাঁহার এক পুরাতন কর্মচারীকে কর্ণাটের নবাব-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আনোয়ারউদ্দিন

দাক্ষিণাত্যের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে ইংরাজ ও ফরাসী জাতি ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইল।

ইংরাজ ও ফরাসীগণ প্রথম দিকে ভারতের নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া পাশাপাশি থাকিয়া নির্বিবাদে বাণিজ্য করিত। কিন্তু শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে নামক এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ডুপ্লে প্রথমে চন্দননগরের শাসনকর্তা ছিলেন। সুচতুর ও দূরদর্শী ডুপ্লে দেখিলেন যে, ভারতের দেশীয় রাজারা অত্যন্ত দুর্বল ও পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত। এই সুযোগে তিনি ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইল ইংরাজ। সুতরাং তিনি ভারতে ইংরাজশক্তি ধ্বংস করিবার সুযোগ ও উপায় খুঁজিতে লাগিলেন।

ডুপ্লে



ডুপ্লে

ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের নিজামের এবং কর্ণাটের নবাবের উত্তরাধিকার লইয়া গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল। ইংরাজেরা এক পক্ষে এবং ফরাসীরা অপর পক্ষে যোগ দিয়া ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হইল। এই সকল যুদ্ধ "কর্ণাটের যুদ্ধ" নামে অভিহিত।

দাক্ষিণাত্যে 'কর্ণাটের যুদ্ধ'

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরাজ সেনানায়ক ক্লাইভের অসাধারণ সাহস ও

সমরকুশলতার ফলে শেষ পর্যন্ত ইংরাজেরা জয়ী হইয়া কর্ণাটে আধিপত্য লাভ করিল। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইল এবং তাহাদের ভারতে রাজ্য স্থাপনের আশা চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়া গেল।

ক্লাইভ—ইংরাজদের জয়লাভ

(২) **মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার :** সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান ভারত-ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বলিষ্ঠ ও সাহসী মারাঠাগণ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বে বিস্তীর্ণ মালভূমি ও সমুদ্র উপকূলের কোঙ্কণ অঞ্চলে বসবাস করিত। তাহাদের মধ্যে ছিল অত্যধিক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণী ও বেশ কিছুসংখ্যক শূদ্র কৃষক সম্প্রদায়। অনুর্বর ভূমিতে চাষ-আবাদ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত বলিয়া স্বভাবতঃই তাহারা ছিল পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। মারাঠা দেশে কোন প্রাচীন স্তম্ভ বা ঐতিহ্যের নিদর্শন ছিল না। এমন কি, তাহাদের বীরত্বের কোন পূর্ব-ইতিহাসও পাওয়া যায় না। তবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের কোন অভাব ছিল না এবং ইহা মারাঠাদিগের মধ্যে ঐক্য-বোধ উন্মেষে সাহায্য করিয়াছিল। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের অধীনে মারাঠা নায়কগণ শাসন ও সমর বিভাগে নিযুক্ত হইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র মারাঠা জাতির এই ব্যাপক অভ্যুত্থান শিবাজীর নেতৃত্ব ভিন্ন অন্য কোনভাবে সম্ভব ছিল না।

মারাঠা জাতির উত্থানে শিবাজীর অবদান

শিবাজী : শিবাজীর পিতা শাহজী ছিলেন বিজাপুর সুলতানের অধীনে একজন জায়গিরদার। পুণা জেলায় তাঁহার বিস্তীর্ণ জায়গির ছিল। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবনের দুর্গে শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দ্বিতীয় পত্নীকে লইয়া অন্যত্র বসবাস করিতে শুরু করেন। ফলে মাতা জীজাবাঈ ও দাদাজী খণ্ডদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে শিবাজীর জীবন শুরু হয়। ধর্মপরায়ণা ও কর্তব্যনিষ্ঠা মাতার নিকট হইতে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনীর সততা, শৌর্য ও ধর্মাচরণের আদর্শ শ্রবণ করিয়া বাল্যকালেই তিনি ধর্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ

প্রথম জীবন

হন। বৈদেশিক মুঘল শাসনের অত্যাচার হইতে স্বদেশ রক্ষা ও স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। ক্রমে তিনি পার্বত্য মাওয়ালী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ হন এবং তাহাদের লইয়া একটি সৈন্যদল গঠন করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন।


শিবাজী

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব যখন উত্তর ভারতে নানা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় দাক্ষিণাত্যে শিবাজী মারাঠা শক্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ক্রমে শিবাজী কোঙ্কণ প্রদেশে একটি শক্তিশালী স্বাধীন মারাঠা রাজ্য স্থাপন করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যে লুটপাট শুরু করেন। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতিগণ শিবাজীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেও তাঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্য উত্তরে সুরাটের নিকট হইতে দক্ষিণে কানাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী মারাঠাদের রাজা হন। অতঃপর ঔরঙ্গজেব স্বয়ং মারাঠা শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। প্রথমেই তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করেন। তারপর মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শম্ভুজী মুঘল সৈন্যের হাতে বন্দী অবস্থায় ঔরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হন। ফলে শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুঘল-মারাঠা যুদ্ধে তীব্রতা সঞ্চারিত হয়। এই সময় মারাঠারা যুদ্ধে হারিলেই লুকাইয়া পড়িত, আবার সুযোগ পাইলেই মুঘল সৈন্যকে

শম্ভুজীর মৃত্যু—রাজারামের সিংহাসন প্রাপ্তি

আক্রমণ করিত। ফলে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইল, তখনও মারাঠাদের পরাজয়ের কোন লক্ষণ ছিল না।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শম্ভুজীর পুত্র শাহু মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার শৈশব মুঘল প্রাসাদে অতিবাহিত হইবার ফলে স্বভাবতঃই তিনি অলস ও অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ —পেশোয়াতন্ত্রের উত্থান

এমতাবস্থায় বালাজী বিশ্বনাথ নামে একজন ব্যক্তি তাঁহার সহায় হইলেন। সুতরাং শাহু তাঁহাকে পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী-পদে নিয়োগ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার বলে শীঘ্রই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। ক্রমে পেশোয়া-পদ বংশানুক্রমিক হইয়া গেল এবং শাহুর বংশধরগণ 'ছত্রপতি' উপাধি লইয়া নামেমাত্র রাজা ছিলেন। এইভাবে মহারাষ্ট্রে পেশোয়াতন্ত্রের উত্থান হইয়াছিল।

ক্রমে মারাঠা পেশোয়াগণ একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-এর সময় এই সাম্রাজ্য দক্ষিণে মহারাষ্ট্র হইতে উত্তরে চম্বল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অতঃপর বালাজী বাজীরাও-এর সময় মারাঠা সৈন্য দিল্লী অধিকার করে এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত মারাঠাশক্তি বিস্তৃত হয়। কিন্তু মারাঠাদের এই সাফল্য স্থায়ী হইল না। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মারাঠা শক্তি অন্ততঃ সাময়িকভাবে প্রতিহত হইয়াছিল।

(৩) **শিখ জাতির উত্থান ও সংগঠন :** পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাঞ্জাব প্রদেশে নানক নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন। নানকের শিষ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল জাঠ কৃষক, তাহারা নিজদিগকে 'শিখ' বা গুরুর শিষ্য বলিত।

শিখগণ প্রথমে শান্তিপ্রিয় ছিল। সম্রাট আকবর অমৃতসরে তাহাদিগকে একটি পুষ্করিণী-সহ কিছু জমি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে শিখেরা তথায় তাহাদের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করিয়া ইহাকে শিখসম্প্রদায়ের ধর্মকেন্দ্রে পরিণত করে।

শিখদের ধর্মীয় প্রধানকে 'গুরু' নামে অভিহিত করা হয়। ক্রমে গুরুর

পদ বংশানুক্রমিক হইয়া পড়ে। পঞ্চম গুরু অর্জুনের সময়ে শিখদের ধর্মপুস্তক 'আদিগ্রন্থ' সংকলিত হয়। বস্তুতঃ সেই সময় হইতে শিখসম্প্রদায় ক্রমশঃ সংগঠিত হইতে থাকে। ফলে বিচ্ছিন্ন শিখগণ সহসা এক সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। শেষ জীবনে গুরু অর্জুন মুঘল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খস্রুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কারণে সম্রাটের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। ইহার ফলে শিখদের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শিখ-বিদ্বেষের বীজ তখনই বপন করা হইয়াছিল।

পঞ্চম গুরু অর্জুন—মুঘলদের সহিত বিরোধের সূচনা

পরবর্তী গুরু হরগোবিন্দ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়া শিখদের যোদ্ধৃসম্প্রদায়ে পরিণত করেন। নবম গুরু তেগ বাহাদুর ঔরঙ্গজেবের গোঁড়া ধর্মান্ধ নীতির বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানাইয়া বন্দী হন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া আসিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করিলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। তেগ বাহাদুর শির দিলেন কিন্তু 'সর্' (ধর্ম) দিলেন না।

গুরু হরগোবিন্দ ও তেগ বাহাদুর

তেগ বাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ শিখদের দশম ও শেষ গুরু। তাঁহার সময় মুঘল শক্তির সহিত শিখদের প্রকাশ্য যুদ্ধের সূচনা হয়। গুরু গোবিন্দের আদেশে শিখগণ কেশ, কাঙ্গা (চিরুনি), কাচ্ছা (জাঙ্গিয়া), কৃপাণ, কড়া (লৌহ-কঙ্কণ) ধারণ প্রভৃতি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে। এই ব্রত পঞ্চ 'ক' নামে পরিচিত।

গুরু গোবিন্দ সিং

গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর (১৭০৮ খ্রীঃ) পর শিখগণ বান্দা নামক এক নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্বে শিখগণ অচিরেই শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ দখল করে। লৌহগড়ে এক স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপিত হয়। অতঃপর গুরুদাসপুর গড়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় মুঘল সৈন্যের হস্তে বান্দা ধৃত ও বন্দী হন এবং অশেষ নির্যাতনের পর সম্রাটের নির্দেশে তাঁহাকে হাতীর পদতলে নিক্ষেপ করা হয় (১৭১৬ খ্রীঃ)। স্বভাবতঃই এই ঘটনার পর শিখ জাতিকে অশেষ নির্যাতনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সময় কাপুর সিং নামে জনৈক শিখ নেতা দলীয় সংগঠনকে

দৃঢ় করেন। এবং ইহার পরিণাম হইল 'খালসা দল' গঠন।* খালসা হইল ধর্মের ভিত্তিতে সামরিক সংগঠন। ফলে শিখগণ দুর্দিনেও তাহাদের আত্মপ্রত্যয় হারাইল না। অতঃপর বৈদেশিক আক্রমণের ফলে পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া শিখগণ ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকে। সমগ্র পাঞ্জাবে শিখদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

শিখরা ক্রমে বারটি মিস্‌ল্ বা রাজ্যাংশে বিভক্ত হইয়া গড়ে। তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের অন্ত ছিল না। শিখজাতির এই গৃহ-বিবাদ ইংরাজ শক্তির ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিখদের মধ্যে রণজিৎ সিং নামে একজন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব ঘটে।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা বাবরের—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া বাবর কর্তৃক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার।

২. বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুনের রাজত্বকালে আফগান বীর শের শাহের দিল্লী অধিকার।

৩. শের শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন কর্তৃক দিল্লী পুনরুদ্ধার—আকবরের রাজত্বের সূচনা।

৪. আকবরের রাজ্যজয়—রাণা প্রতাপের সহিত সংঘর্ষ। ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুঘল সম্রাজ্যভুক্ত।

৫. জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার—দক্ষিণ ভারতে প্রসার।

৬. ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল—শিবাজী—হিন্দু বিদ্বেষ, উত্তর ভারতে বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্যে গোলযোগ। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা।

৭. মুঘল সমাজ সামন্ততান্ত্রিক, অভিজাতদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংযত আচরণ—সুলভ খাদ্যদ্রব্য—হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি।

* An Advanced History of India (1951 Ed.), P. 542.

৮. অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষিদ্রব্যের প্রাচুর্য এবং বয়ন শিল্পের উন্নতি লক্ষণীয়।

৯. রালফ্ ফিচ্, টমাস রো, তাভার্নিয়ে প্রভৃতি একাধিক ইউরোপীয় পর্যটকের ভারত ভ্রমণ এবং উহাদের লিখিত বিবরণ।

১০. ইউরোপীয় বণিকদের আগমন—দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব। কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরাজদের সাফল্য।

১১. শিবাজী ও পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান এবং পরিশেষে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পরাজয়।

১২. শিখদের উত্থান, পঞ্চম গুরু অর্জুনের পর হইতে মুঘলদের সহিত সংঘর্ষের সূচনা—গুরু পরম্পরায় নেতৃত্বদান, সংগঠন –'খালসা' বা ধর্মের ভিত্তিতে সামরিক সংগঠন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রণজিৎ সিং-এর উত্থান।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। বাবরের ভারত আক্রমণকালে দিল্লীর সুলতান কে ছিলেন? কিভাবে বাবর ভারতে মুঘল শাসনের সূচনা করিয়াছিলেন? ২। আকবরের রাজ্যজয় সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৩। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৪। মুঘলযুগে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ। ৫। কিরূপ পটভূমিতে দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হইয়াছিল? ৬। কিভাবে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান হইয়াছিল? ৭। শিবাজীর প্রথম জীবন ও মুঘলশক্তির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৮। গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বলাভের পূর্ব পর্যন্ত শিখ জাতির উত্থান ও সংগঠন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৯। শিখ জাতির উত্থানের জন্য গুরু গোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার পরবর্তী শিখ নেতাদের কার্যকলাপ আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) কিভাবে সংগ্রাম সিংহ বাবরের সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইয়াছিলেন? ঐ যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল? (২) রাণাপ্রতাপ কিভাবে মুঘলদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? (৩) মুঘল যুগে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণী কিভাবে জীবন যাপন করিত? (৪) মুঘল যুগে শিল্প কিরূপ উন্নত ছিল? (৫) মুঘল যুগে কোন্ কোন্

পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন ? (৬) কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতে আসিয়াছিলেন ? (৭) পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল ?

বিষয়মুখী ঃ

এক কথায় উত্তর দাওঃ (ক) কে ভারতে মুঘল রাজত্বের সূচনা করিয়াছিলেন ? (খ) হুমায়ুন কাহার হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন ? (গ) বাবর কোন্ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন ? (ঘ) হলদিঘাটের যুদ্ধে কে পরাজিত হইয়াছিলেন ? (ঙ) কে হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম ছিলেন ? (চ) ডুপ্লে কে ছিলেন ? (ছ) দাক্ষিণাত্যে অনুষ্ঠিত ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ কি নামে অভিহিত হয় ? (জ) ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কাহারা জয়ী হইয়াছিল ? (ঝ) শিবাজীর মৃত্যুর পর কে মারাঠাদের রাজা হইয়াছিলেন ? (ঞ) শাহু কাহাকে পেশোয়া পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ? (ট) কোন্ যুদ্ধের ফলে মারাঠা পেশোয়াদের অগ্রগতি সাময়িকভাবে প্রতিহত হইয়াছিল ? (ঠ) শিখ কথাটির অর্থ কি ? (ড) শিখদের ধর্মীয় প্রধানকে কি বলা হয় ? (ঢ) কে শিখদের শেষ গুরু ছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন —। (২) পানিপথের প্রথম যুদ্ধে — পরাজিত করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। (৩) হুমায়ুন আফগানবীর — কাছে পরাস্ত হইয়া পারস্যে পলায়ন করেন। (৪) রাজপুত সামন্তদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন — সিংহের পুত্র প্রতাপ সিংহ। (৫) বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের — নাম উল্লেখ্য।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও ঃ

(১) খানুয়ার যুদ্ধে কে পরাস্ত হন ? (২) বাবরের মৃত্যুর পর কে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন ? (৩) রাণা প্রতাপ কোন্ যুদ্ধে মুঘলদের কাছে পরাস্ত হন ? (৪) কাহার রাজত্বকালে হকিন্স ও টমাস রো ভারতে আসিয়াছিলেন ? (৫) ডুপ্লে প্রথমে কোথায় আসিয়াছিলেন ? (৬) বালজী বিশ্বনাথ কে ছিলেন ? (৭) দশম গুরুর নাম কি ছিল ?

সপ্তম অধ্যায়

ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

(ক) প্রথম স্তর—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

সূচনা : বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীঃ) জয়লাভের পরে ক্লাইভের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম সোপান। হেস্টিংসের আমল (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) হইতে ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারা নিরবচ্ছিন্ন, প্রথমে মহীশূর পরে মারাঠা এবং শেষে শিখ—সর্বাধিক শক্তিশালী এই তিন দেশীয় রাজ্যের পতনের ফলে বৃটিশ শাসন ভারতের তিনদিকে প্রসারিত হয় এবং ডালহৌসীর আমলে সে-শাসন ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সাম্রাজ্য-বিস্তারের ধারা

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় বাংলাদেশকে কেন্দ্র করিয়া। বাংলাদেশে অনেক দিন হইতে ইংরাজদের বাণিজ্য-কুঠি ছিল। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানির প্রতিনিধি জব চার্ণক বাংলার নবাবের অনুমতি লইয়া সুতানুটি গ্রামে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজরা সেখানে ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং স্থানীয় জমিদারের নিকট হইতে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইল।

কলিকাতার জমিদারী বন্দোবস্ত

ইতিমধ্যে বাংলায় নবাবী শাসনের পত্তন হইয়াছিল। বাংলার নবাবগণ স্বভাবতঃই ইংরাজদের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বাধা দিতেন। কিন্তু নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়। কারণ আলিবর্দী খাঁ তাঁহার রাজত্বকালের বেশির ভাগ সময়ই মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

নবাব আলিবর্দী খাঁ

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার

দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হন। অল্পকাল পরেই ইংরাজদের সহিত নানা কারণে নবাবের বিবাদ আরম্ভ হইল। প্রথমে নবাব ইংরাজদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা দখল করেন।

সিরাজউদ্দৌলা—ইংরাজদের সহিত বিবাদ

ইতিমধ্যে ইংরাজগণ দক্ষিণ ভারতে শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। ফলে কলিকাতায় ইংরাজদের পরাজয়ের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে সেখান হইতে ক্লাইভ ও ওয়াটসন সৈন্যসহ বাংলায় আসিয়া কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন। এই সময় ক্লাইভ বাংলায় নবাব-বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হন। স্থির হয় যে, নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধে যোগ দিবেন না। প্রায় বিনাযুদ্ধে ইংরাজের জয় হইবে; যুদ্ধে জয় হইলেই মীরজাফরকে নবাব করিতে হইবে। এইভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া ইংরাজগণ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে। পরবর্তী নবাব মীরজাফর ইংরাজদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। ফলে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে ইংরাজগণ বাংলার শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করে।



সিরাজদ্দৌলা

পলাশির যুদ্ধ—ইংরাজদের জয়লাভ

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম বাংলার নবাব হইয়া প্রথম হইতেই স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে চাহিয়াছিলেন। ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাঁহার সহিত ইংরাজদের বিবাদ শুরু হইল। ইংরাজগণ পর পর তিনটি যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করিল। এমতাবস্থায় মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের সহিত মিলিত হইয়া আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে আবার তিনি পরাস্ত হইলেন।

মীরকাশিম

বক্সারের যুদ্ধ

বক্সারের যুদ্ধ ছিল পলাশির যুদ্ধের পরিপূরক। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব বিস্তারের ক্ষেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় ক্লাইভ বাংলার গভর্ণর হইয়া ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং বাদশাহ্ শাহ্ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানির নামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লইলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। স্থির হইল যে, কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করিবে এবং বাদশাহ্‌কে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিবে। নবাবের সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, কোম্পানি রাজস্ব আদায় করিবে এবং সৈন্য রাখিয়া দেশরক্ষা করিবে নবাব দেশ শাসন করিবেন ও বিচারকার্য চালাইবেন এবং তাহার জন্য বার্ষিক তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি



লর্ড ক্লাইভ

ইহা ছাড়া কোম্পানি কর্তৃক নায়েব নাজিম নামে একটি নূতন পদ সৃষ্টি করা হইল এবং দেওয়ানি বিচার-ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব এই নূতন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হইল। এই ব্যবস্থার ফলে নবাব প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির বৃত্তিভোগী হইলেন, যদিও আইনের দিক দিয়া তিনিই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের জন্য দায়ী রহিলেন; নবাবের রহিল দায়িত্ব অথচ সমস্ত ক্ষমতা রহিল কোম্পানির হস্তে। ইহাই ছিল ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা।

দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা

ওয়ারেন হেস্টিংস ঃ ক্লাইভের পর ভেরেলেস্ট ও কার্টিয়ার ক্রমান্বয়ে কোম্পানির গভর্ণর ছিলেন। অতঃপর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। তাঁহার আমলে বাদশাহ্ শাহ্

আলমের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কারণ বাদশাহ্ তখন মারাঠাদের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া হেস্টিংস অযোধ্যা রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে অযোধ্যার নবাবকে রোহিলখণ্ড জয় করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্লাইভ ও হেস্টিংসের চেষ্টায় উত্তর ভারতে ইংরাজ শক্তির প্রসার ঘটিলেও ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভারতে হায়দর আলীর নেতৃত্বে মহীশূরের অভ্যুত্থান ও মারাঠাশক্তির পুনরভ্যুত্থানের ফলে ইংরাজশক্তি যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হইল।



ওয়ারেন হেস্টিংস

মহীশূরের অভ্যুত্থান : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হায়দর আলীর নেতৃত্বে মহীশূরের অভ্যুত্থান ইংরাজদের রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে এক দারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রথম জীবনে হায়দর ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। মহীশূর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি নঙ্গরাজ-এর অধীন সমর বিভাগে তিনি একজন সামান্য 'নায়েক' পদে নিযুক্ত হইয়া জীবন শুরু করেন। এই সময় তিনি ত্রিচিনোপল্লীতে ইংরাজ ও ফরাসীর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বিদেশীদের সমরকৌশল বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ক্রমশঃ তিনি নঙ্গরাজ-এর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে হায়দরের পদোন্নতি ঘটে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত হন। অতঃপর মহীশূর রাজ্যের আর্থিক দুর্গতি ও সৈন্য-

হায়দর আলীর উত্থান



হায়দর আলী

বাহিনীর বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি নঙ্গরাজ-এর প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া এবং বিরোধী ও চক্রান্তকারীদের পরাভূত করিয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মারাঠা, নিজাম ও ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ

হায়দরের সহিত প্রথম হইতেই ইংরাজদের কোন সদ্ভাব ছিল না। আর্কটের ইংরাজ সাহায্যপুষ্ট নবাব মহম্মদ আলী হায়দরের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছাড়াও কতকগুলি অঞ্চলের আধিপত্য লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। আর্কটের নবাবের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মাদ্রাজে অবস্থিত ইংরাজ সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল। ফলে ইংরাজ শক্তির উদ্যোগে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম ও মারাঠা শক্তি সম্মিলিত হইয়াছিল। এই অবস্থার প্রথমে নিজাম মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী নিজামকে সাহায্য করিতে মহীশূর অভিমুখে যাত্রা করিল। এ-দিকে মারাঠা পেশোয়া প্রথম মাধবরাও যুদ্ধযাত্রা করিয়া হায়দরকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। চতুর হায়দর এই বিপদকালে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথমেই মারাঠা পেশোয়াকে রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চল ও অর্থদানে তুষ্ট করিলেন। অতঃপর তিনি আর্কট রাজ্য জয় করিয়া বিজিত রাজ্য নিজামের সহিত ভাগাভাগি করিয়া লইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে নিজাম যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইবার হায়দর ইংরাজদের সহিত এককভাবে যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করিলেন। এমন কি, ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরুপায় হইয়া ইংরাজগণ হায়দরের সহিত সন্ধি করিল (১৭৬৯ খ্রীঃ)। পরস্পরের বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করা হইবে এবং তৃতীয় পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হইলে একে-অপরকে সাহায্য করিবে, ইহাই ছিল এই সন্ধির মূল কথা। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৬-৬৯ খ্রীঃ) নামে খ্যাত।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

হায়দর ছিলেন বাস্তববাদী ও দূরদর্শী শাসক। তখনকার পরিস্থিতিতে ইংরাজদের সহিত আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। নিজাম ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁহার উপর নির্ভর করা

চলিত না। মারাঠা পেশোয়াই ছিল তাঁহার প্রধান শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী। বারবার যুদ্ধ জয় করিয়া তিনি মহীশূরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্য হায়দর ইংরাজ সামরিক শক্তির সাহায্য লইয়া মারাঠাদের দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আশা বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ১৭৬৯-৭২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ পুনরায় হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিলে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তিনি ইংরাজদের নিকট হইতে কোন সাহায্যই পাইলেন না।

মারাঠা আক্রমণ

এইভাবে ইংরাজগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়া হায়দর ইংরাজদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার সহিত এক নূতন সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইংরাজেরা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী অধিকৃত স্থান মাহে বন্দর আক্রমণ ও দখল করিল। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া হায়দর ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৭৮০ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে হায়দরের পরাক্রম ও সাফল্যে ইংরাজদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ হায়দরের মৃত্যু হইল। তখন হায়দরের পুত্র টিপু যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। শেষে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি দ্বারা যুদ্ধ-বিরতি হইল। যে যাহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া দিল, যুদ্ধ-বন্দীদিগকেও ফিরাইয়া দিল।

হায়দরের মৃত্যু—
টিপু সুলতান



টিপু সুলতান

ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি ছিল সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি মাত্র। উভয় পক্ষই পরবর্তী পর্যায়ের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হইতেছিল। এমতাবস্থায় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপু ইংরাজদের আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে টিপু পরাজিত হন এবং সন্ধির শর্তানুযায়ী স্বীয় রাজ্যের প্রায় অর্ধেক ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে ইউরোপে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। টিপু এই সময় ফরাসী সাহায্যলাভের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ শক্তি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহা চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে বিপুল পরাক্রম সত্ত্বেও টিপু যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। টিপুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে মহীশূর রাজ্যের পতন হইল।

মারাঠাশক্তির পুনরভ্যুত্থান : তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ) মারাঠাদের নিদারুণ পরাজয় মারাঠাশক্তিকে সাময়িকভাবে সংকুচিত করিলেও পেশোয়া মাধব রাও (১৭৬১-১৭৭২ খ্রীঃ)-এর নেতৃত্বে মারাঠাশক্তির সামরিক খ্যাতি ও গৌরব পুনরুজ্জীবিত হয়। হায়দরাবাদের নিজাম মারাঠা রাজ্য আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মহীশূরের সহিত যুদ্ধে মারাঠারাই জয়ী হইয়াছিল। ক্রমে মারাঠা-

মাধব রাও

শক্তি উত্তর ভারতের মালব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি হৃতরাজ্যগুলি উদ্ধার করিয়া রাজপুত সর্দারদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া, জাঠ ও রোহিলাদের শক্তি খর্ব করিয়া অপ্রতিহত গতিতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়। দিল্লী দখল করিয়া তাহারা এলাহাবাদে পলাতক ও ইংরাজদের বৃত্তিভোগী বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে (১৭৭২ খ্রীঃ)। কিন্তু এই সময় আকস্মিকভাবে পেশোয়া মাধব রাও-এর মৃত্যু ঘটিলে মারাঠাদের মধ্যে এক ঘোর অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।

উত্তর ভারতে মারাঠাশক্তির বিস্তার

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাধব রাও-এর মৃত্যুতে তাঁহার ভাই নারায়ণ রাও পেশোয়া-পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু শীঘ্রই পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবার চক্রান্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থায় রঘুনাথ রাও নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু নারায়ণ রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার

এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে মারাঠা নায়কদের মধ্যে অনেকে এই নবজাত সন্তানের উত্তরাধিকার সমর্থন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহায়তায় বালাজী জনার্দন নামে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কূটনীতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ এই শিশুপুত্রকে পেশোয়া-পদে অধিষ্ঠিত করেন। বালাজী জনার্দন ইতিহাসে নানাফড়নবীশ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

পেশোয়া পরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব



নানাফড়নবীশ

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে মারাঠাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া ইংরাজগণ তাহাদের অভ্যন্তরীণ গোলোযোগে হস্তক্ষেপ করে। ফলে, মারাঠাদের সহিত ইংরাজদের কয়েক বৎসর ভীষণ যুদ্ধ হইল। শেষে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সলবাই-এর সন্ধিতে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হইল। স্যার জন শোর ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে ইঙ্গ-মারাঠা রাজনৈতিক সম্পর্কে কোন ভাঙন দেখা দেয় নাই।

ওয়ারেন হেস্টিংস—প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

১৭৯৪ ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে মহাদজী সিন্ধিয়া ও নানা-ফড়নবীশের মৃত্যুতে মারাঠাদের মধ্যে অভিজ্ঞ নেতার অভাব দেখা দিল। এ-দিকে মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ছিলেন অত্যন্ত অপদার্থ ও কুচক্রী। অচিরেই পেশোয়ার দরবারে ক্ষমতালাভের জন্য দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্ত রাও হোলকার—এই দুই মারাঠা প্রধানের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হোলকার সিন্ধিয়ার সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া পুণা আক্রমণ করিয়া পেশোয়াকে গদিচ্যুত করেন। সেই সময় লর্ড ওয়েলেসলি ভারতের গভর্ণর ছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। ফলে গদিচ্যুত পেশোয়া

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও—বেসিনের সন্ধি

ইংরাজ সাহায্যের আশায় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। ইহা বেসিনের চুক্তি নামে খ্যাত।

এইভাবে পেশোয়া ইংরাজদের প্রাধান্য মানিয়া লইলেও মারাঠা প্রধানগণ ইংরাজদের সার্বভৌমত্ব সহজে মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইংরাজদের সহিত তাহাদের যে যুদ্ধ হয় তাহা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধের প্রথম ভাগে হোলকার সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহিত যোগ দেন নাই।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনী আসাই নামক স্থানের যুদ্ধে (সেপ্টেম্বর, ১৮০৩ খ্রীঃ) পরাস্ত হইল। ভোঁসলের সৈন্য আরগাঁও-এ পুনরায় পরাজিত হইল। উত্তর ভারতেও সিন্ধিয়ার সৈন্যদল পরাস্ত হইল। তখন সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে উভয়েই ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। উভয়েই ইংরাজের আশ্রিত মিত্র-রাজ্য হইলেন এবং আপন আপন রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর হোলকার স্বীয় শক্তিবলে ইংরাজদের মিত্র-রাজ্য জয়পুর আক্রমণ করিলেন এবং জয়ী হইলেন। তারপর তিনি দিল্লী আক্রমণ করিলেন, কিন্তু উহা দখল করিতে পারিলেন না।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা শক্তির সহিত ইংরাজদের শান্তি-চুক্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজদের অধীনতা হইতে মুক্তি-লাভের জন্য তৎপর হন। এই সময় ইংরাজ গভর্ণর লর্ড হেস্টিংস পেশোয়া-পদ লোপ করিয়া মারাঠা রাজ্যের সকল ক্ষমতা কোম্পানির অধীন করিতে চাহিলেন। সেইমত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের সহিত পেশোয়ার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু ছ'মাস পরেই পেশোয়ার নির্দেশে পুণার বৃটিশ দূতাবাস আক্রান্ত হয় এবং ইংরাজ রেসিডেন্ট অগ্নিদগ্ধ হন। ফলে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ



লর্ড হেস্টিংস

পর পর তিনটি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পেশোয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। পেশোয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোলকার ও ভোঁসলে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারাও পরাস্ত হইলেন। ফলে, তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ ভাঙ্গিয়া গেল, পেশোয়া-পদ লোপ পাইল এবং মারাঠাশক্তির পতন হইল।

মারাঠাশক্তির পতনে শংকিত হইয়া ১৮১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে উদয়পুর, কোটা, বুন্দি, কিষণগড়, বিকানীর, জয়পুর, জয়শলমীর প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যগুলি ইংরাজদের অনুগত মিত্র-রাজ্যে পরিণত হইল। ফলে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ শক্তির একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। এখন কেবল পশ্চিমে সিন্ধুদেশ ও শিখরাজ্য এবং পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হইল।

(খ) দ্বিতীয় স্তর—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

শিখরাজ্য জয় ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীঃ) বিভিন্ন শিখদল বা মিস্‌লকে একত্র করিয়া পাঞ্জাবে এক পরাক্রান্ত শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রণজিৎ যেমন বীরপুরুষ ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁহার অসাধারণ সংগঠন প্রতিভা। স্বভাবতঃই তাঁহার চেষ্টা ও উৎসাহে শিখসৈন্য ভারতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সৈন্যে পরিণত রহিল।



রণজিৎ সিং

এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে রণজিৎ শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরস্থ শিখ রাজ্যগুলি জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় সেখানকার শিখেরা ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফলে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে

ইংরাজদের সহিত রণজিৎ সিং-এর অমৃতসরে এক সন্ধি হইল। ইহার ফলে শতদ্রু নদী রণজিৎ সিং-এর রাজ্যের পূর্ব সীমানা হইল। শতদ্রুর পূর্ব পারের নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতি ছোট ছোট শিখ রাজ্যগুলি ইংরাজদের আশ্রয়ে রহিল। তখন রণজিৎ পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করিলেন।

অমৃতসরের সন্ধি ১৮০৯ খ্রীঃ

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ-এর মৃত্যুর পর শিখদের অভ্যন্তরীণ সংহতি নষ্ট হইয়া যায় এবং সামরিক বাহিনী রাজ্যের প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে প্রথম শিখযুদ্ধে (১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ) শিখরা পরাজিত হইলে লাহোরের সন্ধি (১৮৪৬ খ্রীঃ) দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়। ইংরাজগণ শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী জলন্দর দোয়াব লাভ করিল।

প্রথম শিখযুদ্ধ



লর্ড ডালহৌসী

প্রথম শিখযুদ্ধে শিখসৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের দোষেই পরাস্ত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা আর একবার ইংরাজদিগের সহিত শক্তি-পরীক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। লর্ড ডালহৌসীর আমলে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধে (১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ) শিখসৈন্য পুনরায় সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হইল। অতঃপর ইংরাজেরা ঘোষণাবলে পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইল।

অন্যান্য রাজ্য অধিকার : শিখদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ দখল করিয়াছিল। এই সময়ে দক্ষিণ ব্রহ্ম অধিকৃত হয় এবং কিছুকাল পরে উত্তর ব্রহ্ম বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য উপায়ে অনেকগুলি রাজ্য অধিকার করা হইয়াছিল। কোন আশ্রিত রাজা অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে তাঁহার রাজ্য দখল করা হইত। ইহাই ছিল লর্ড ডালহৌসী প্রবর্তিত 'স্বত্ব বিলোপ নীতি'। এই নীতি প্রয়োগ করিয়া সাতারা, ঝাঁন্সী, নাগপুর, জৈৎপুর, উদয়পুর, সম্বলপুর

প্রভৃতি রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এ-ছাড়া, কুশাসনের অজুহাত দেখাইয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজ্য দখল করা হয়।

(গ) সিপাহী বিদ্রোহ

সূচনা ঃ ডালহৌসীর পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং এ-দেশে আসিবার মাত্র সাত মাসের মধ্যেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এক 'মহা বিদ্রোহের' সূচনা হইল।

বিদ্রোহের কারণ ঃ এই বিদ্রোহের মূলে রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয় প্রভৃতি নানাবিধ কারণ ছিল। কিন্তু সিপাহী সৈন্যের বিদ্রোহের মাধ্যমে ইহার প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া ইহা 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত।

রাজনৈতিক

ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার পর বৃটিশ শক্তি 'ছলে-বলে-কৌশলে' একে একে দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করিতেছিল। সর্বোপরি লর্ড ডালহৌসী আশ্রিত রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া এবং মুঘল বাদশাহের বংশধরদের দিল্লীর প্রাসাদ হইতে অপসৃত করিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনে গভীর ভীতি ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন।

অর্থনৈতিক

দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংরাজগণ ভারতকে স্বদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলে ভারত বৃটেনজাত পণ্য-দ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব শুরু হইয়াছিল এবং শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া ভারতের কুটির ও ছোট ছোট শিল্পগুলি একে একে ধ্বংস হইয়া গেল। ইহা ভিন্ন ইংরাজ-প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা দেশবাসীকে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট করে।

সামাজিক

বৃটিশ শাসকবর্গ এ-দেশের লোকদের স্বভাবতঃই ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং এ-দেশের ধর্ম ও আচার-আচরণ সম্বন্ধেও তাহাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। এইরূপ বৈষম্যমূলক পরিস্থিতিতে শাসক শ্রেণী দ্বারা সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাও সাধারণ ভারতবাসীর নিকট নিছক দুরভিসন্ধিরূপে প্রতিভাত হইল।

ধর্মীয়

ইংরাজ মিশনারীরা যেভাবে এ-দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইয়া আসিতেছিল তাহাতে ভারতবাসী ধর্মনাশের আশংকায় সচেতন হইয়া উঠে।

প্রত্যক্ষ কারণ

ইতিমধ্যে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যেও নানা অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে একপ্রকার নূতন বন্দুকের প্রচলন করা হইল। উহার টোটাতে চর্বি দেওয়া থাকিত এবং উহা দাঁত দিয়া কাটিতে হইত। সৈন্যদের মধ্যে গুজব রটিয়া গেল যে, টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি দেওয়া আছে। ইহাতে সিপাহীরা জাতিনাশের ভয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণ : ইংরাজ আমলে ভারতে যে-সকল বিদ্রোহ দেখা দেয় সেগুলি অপেক্ষা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ছিল অনেক ব্যাপক ও তীব্র। সেই কারণে ইহাকে নিছক 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। বস্তুতঃ পশ্চিম বিহার হইতে শুরু করিয়া পাঞ্জাবের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই বিদ্রোহ ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করিয়াছিল। বিশেষতঃ অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডে উহা গণ-বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। ভারতের সর্বত্র ইহার প্রভাব ছড়াইয়া না পড়িলেও বহু স্থানে ইহা সাধারণ লোকের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য এই বিদ্রোহকে 'মহাবিদ্রোহ' বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

বিদ্রোহের ব্যর্থতার অনেক কারণ ছিল। সিপাহীরা ইংরাজ সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করিত। সুতরাং কিরূপে যুদ্ধ পরিচালিত করিতে হয় নিজেরা তাহা জানিত না। দ্বিতীয়ত, কোন রকম সুপরিকল্পিত কার্যক্রম লইয়া বিদ্রোহীরা সমবেত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে একতা ও যোগসূত্রের যথেষ্ট অভাব ছিল। তৃতীয়ত, এই বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ ছিল। পক্ষান্তরে, সেই সময় ইংরাজদিগের মধ্যে কয়েকজন প্রতিভাবান্ ও শক্তিসম্পন্ন সেনাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সাহস, চেষ্টা ও যুদ্ধকৌশলে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সৈন্যের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি রক্ষা পাইয়াছিল।

(ঘ) বৃটিশ শাসনের ফলাফল

রাজনৈতিক ঃ ভারতে ইংরাজেরা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। আবার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক সংস্কার ও জাতীয় জাগরণেও ইংরাজদের অবদান স্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হয়। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য দেশের উদার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে থাকে এবং দেশে ক্রমে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখা দিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় ও ডিরোজিও'র শিষ্যগণের অবদান উল্লেখ্য। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী-পদে নিয়োগ প্রভৃতি রামমোহন দাবি করিয়াছিলেন। আর ডিরোজিও'র শিষ্যগণ সভাসমিতি স্থাপন ও সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া জনগণের রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশে সাহায্য করিয়াছিলেন। এইভাবে কোম্পানির স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বভাবতঃই কিছু অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে থাকে। এ-ছাড়া, এই সময় ভারতীয় সমাজে একটি নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয় সমাজ সংস্কার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। এ-দিকে ভারতীয়গণ ইতিমধ্যে রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল এবং এক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অর্থনৈতিক ঃ ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগ হইতেই ভারতের অপর্যাপ্ত ধন-সম্পদ বিশেষতঃ সোনা-রূপা ইংরাজগণ লুণ্ঠন করিতে থাকে। ইহার ফলে ভারতের সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতেছিল এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভাঙন ধরিল। কুটির-শিল্প, বিশেষ করিয়া বয়ন-শিল্পের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বস্ত্র-বয়নের জন্য কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং স্বদেশের শ্রমশিল্পের উন্নতি ও প্রসারকল্পে

বিপ্লবের প্রসার : অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ফ্রান্সে অর্থ সংকট চলিতেছিল। ফরাসী রাজগণ অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং তাঁহারা যুদ্ধে প্রচুর টাকা খরচ করিয়াছিলেন। ক্রমে ফরাসী রাজগণের অমিতব্যয়িতা প্রবাদে



ষোড়শ লুই



আনতোয়ানেৎ

পরিণত হইয়াছিল। রাজা ষোড়শ লুই এবং রানী মারী আনতোয়ানেৎ অতিরিক্ত খরচ করিতেন, যদিও বিপ্লবের প্রাক্কালে রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় ব্যয়-সংক্ষেপের অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া শেষ পর্যন্ত রাজা 'স্টেট্স্ জেনারেল' নামক প্রতিনিধি সভার নির্বাচন ঘোষণা করেন। উচ্চ শ্রেণীর যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ও জনগণের প্রতিনিধি লইয়া এই প্রতিনিধি সভা গঠিত হইত। এই সভার অধিবেশনের শুরুতেই গণ-প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত রাজশক্তির বিরোধ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় রাজা স্টেট্স্ জেনারেলের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে গণ-প্রতিনিধিবৃন্দ পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে নিকটবর্তী টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হইয়া শপথ গ্রহণ করিল যে, ফ্রান্সের জন্য নূতন সংবিধান রচনা না করিয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে না। শেষ পর্যন্ত রাজাকে হার মানিতে হইল। স্টেট্স্ জেনারেল তখন 'জাতীয় সভায়' পরিণত হইল। কিন্তু এই জাতীয় প্রতিনিধি সভা

রাজকোষে অর্থাভাব এবং স্টেট্স্ জেনারেল আহ্বান

তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না দেখিয়া জনগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই এক বিরাট জনতা বিদ্রোহী হইয়া বাস্তিল নামক এক বৃহৎ কারাদুর্গ দখল করিয়া লইল। বাস্তিলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লব সত্য সত্যই আরম্ভ হইয়া গেল।

বাস্তিলের পতন

ক্রমে প্যারিস নগরীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িল। শেষ পর্যন্ত রাজা হার মানিলেন। জাতীয় সভা 'সংবিধান সভা'য় পরিণত হইল। এই সভা প্রথমত মানুষের অধিকারের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করিল। ইহার প্রধান নীতি হইল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। দ্বিতীয়ত, যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকারসমূহ এবং বাণিজ্য ও শিল্পের উপর কর ও বাধাগুলি বিলোপ করিল।

জাতীয় সভার রূপান্তর—সংবিধান সভা

রাজা কিন্তু এতটা পরিবর্তন পছন্দ করিলেন না। তিনি দেশ হইতে গোপনে পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ধরা পড়িয়া নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। এই সময়ে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্সের সর্বত্র তখন দেশপ্রেমের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেশের সকল জায়গা হইতে স্বেচ্ছাসেবকের দল আসিতে লাগিল। যুদ্ধের প্রথমদিকে সাময়িক জয়লাভ করিলেও অচিরেই ফরাসী-বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। ইহার ফলে জনগণের মধ্যে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। এই অবস্থায় ষোড়শ লুইকে সাময়িকভাবে অপসারণ করা হয় এবং ফ্রান্সে 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর রাজার বিচারের দাবি উঠিল এবং বিচারে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ফলে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী ষোড়শ লুই-এর শিরশ্ছেদ করা হয়।

বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ—রাজতন্ত্রের পতন

রাজার শিরশ্ছেদ ও বিপ্লবীদের প্রচারের ফলে ইউরোপের সমস্ত রাজশক্তি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইল। কিন্তু তাহারা যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই ফরাসীরা অগ্রণী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই সময়ে পশ্চিম ফ্রান্সে

ইংরাজগণ ভারতীয় বয়ন-শিল্পের ধ্বংসসাধন করেন। ক্রমে ভারত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার এবং বৃটিশ শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়িল। এক কথায়, ইংরাজ শাসনে ভারত হইল অর্থনীতির দিক হইতে একান্ত পরনির্ভর। কারণ বৃটিশ শাসন ছিল শোষণেরই নামান্তর। এই শোষণের ফলে ভারতীয় কারিগর, ব্যবসায়ী প্রভৃতির অশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তাই তাহারা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ কামনা করিত। ভারতীয় কৃষকগণও ছিল ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বড় শিকার। যদিও এই সময় তাহারা প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয় নাই, তথাপি ঐ যুগে জমিদার ও ছোট ছোট দলনেতার নেতৃত্বে পরিচালিত কতিপয় বিদ্রোহে কৃষকগণ বহুলাংশে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। বস্তুতঃ ঐ সময় কৃষকগণই ছিল ঐ সকল আন্দোলনের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. ইংরাজদের ভারতে রাজ্য বিস্তারের সূচনা। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত বিবাদ—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধ, ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরাজদের সাফল্য।

২. বক্সারের যুদ্ধ, ইংরাজ সৈন্যের সাফল্য। ক্লাইভ কর্তৃক—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হইয়া বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অধিগ্রহণ, দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠা।

৩. ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর শাসনকাল, মহীশূর ও মারাঠাদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ। ইংরাজ শক্তির ক্রমাগত সাফল্য হেতু ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার।

৪. শিখরাজ্য ও রণজিৎ সিং-এর নেতৃত্ব। ডালহৌসীর শাসনকালে শিখদের পতন। নানা অজুহাতে ডালহৌসী কর্তৃক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ।

৫. ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ—কারণসমূহ—প্রকৃতি ও ব্যর্থতা। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব: রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি—সংগঠিত আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শোষণের প্রতিবাদে ভারতীয়দের মনে ক্ষোভের সঞ্চার।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ২। ইংরাজ কোম্পানির দেওয়ানী লাভ ও লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ। ৩। কিভাবে হায়দর আলির উত্থান হইয়াছিল ? ইংরাজদের সহিত কি কারণে হায়দর আলির যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ? ৪। মারাঠা শক্তির কিভাবে উত্থান ও পতন ঘটে ? ৫। রণজিৎ সিং কিভাবে শিখ রাজ্য গঠন করেন এবং কি কারণে উহার পতন হয় ? ৬। সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলি বর্ণনা কর। ৭। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৮। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনগণের অসন্তোষ সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(১) দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝ ? (২) কিভাবে টিপুর সহিত ইংরাজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ? (৩) কি কারণে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ? (৪) রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর শিখদের কিভাবে পতন হইয়াছিল ? (৫) সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল ? (৬) কি কারণে সিপাহীদের পরাজয় ঘটিয়াছিল ? (৭) ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টিতে রাজা রামমোহন রায় ও ডিরোজিও'র শিষ্যদের কি ভূমিকা ছিল ?

বিষয়মুখী ঃ

এক কথায় উত্তর দাও ঃ (ক) কাহার শাসনকালে বাংলায় পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল ? (খ) বক্সার যুদ্ধে কে কাহার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল ? (গ) কে বাংলায় দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন ? (ঘ) কোন্ মারাঠা পেশোয়া বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ? (ঙ) রণজিৎ সিং কোথাকার রাজা ছিলেন ? (চ) 'স্বত্ব বিলোপ' নীতি কে প্রয়োগ করিয়াছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) ইংরাজরা স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও — জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইল। (২) — মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ বাংলার নবাব হন। (৩) বার্ষিক — লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংরাজগণ বাংলা, বিহার ও — দেওয়ানী অধিগ্রহণ করে। (৪) হায়দর আলী

ছিলেন — এর সুলতান। (৫) — ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহত হন। (৬) সলবাই-এর সন্ধিতে — যুদ্ধের অবসান হয়। (৭) —আমলে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ হয়।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) কে সুতানটি গ্রামে প্রথম ইংরাজ কুঠি স্থাপন করেন? (২) সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? (৩) মীরকাশিম কাহাদের সাহায্য লইয়া বক্সারের যুদ্ধ শুরু করেন? (৪) হায়দর আলীর পর কে মহীশূরের সুলতান হন। (৫) কোন্ মারাঠা পেশোয়া বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করেন? (৬) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ইংরাজ গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ

বিপ্লবের যুগ

সূচনা : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে এক অভূতপূর্ব জ্ঞান-দীপ্তির প্রকাশ ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে ঐ যুগে যুক্তিবাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ইতিপূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যেরূপ অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সকল কিছুর মূল্যায়ন শুরু হইয়াছিল এক্ষণে সেইরূপ সর্বক্ষেত্রে যুক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দিল। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইল। স্বভাবতঃই যুক্তিবাদের বিকাশে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও অর্থনীতিবিদ্‌গণের অবদান ছিল। এই প্রসঙ্গে আইজাক নিউটন, রবার্ট বোয়েল, লক্‌, বেন্থাম, মণ্টেস্কু, ভল্‌তেয়ার, রুশো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুক্তিবাদের আবির্ভাবে স্বভাবতঃই ইউরোপের মূক জনতা মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল ১৭৬৩ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা : যথা, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লব।

(ক) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

সূচনা : সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু ইংরাজ স্বদেশ ছাড়িয়া নূতন দেশের সন্ধানে সমুদ্র পাড়ি দিয়া উত্তর আমেরিকার উপকূলভাগে উপস্থিত হইয়াছিল। সেখানে তাহারা আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদিগকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেদের বসতি স্থাপন করে। তাহারা বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সভ্য সমাজ গড়িয়া তোলে। এইরূপে সেখানে তেরটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই উপনিবেশগুলি অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিত।

উপনিবেশ স্থাপন

তাহাদিগকে বাণিজ্য-সংক্রান্ত কতিপয় বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। কিন্তু ঐগুলি তত কড়াকড়িভাবে পালন করা হইত না; প্রায়ই এই আইনগুলিকে এড়াইয়া চলা হইত।

বিদ্রোহের কারণ : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে আমেরিকায় ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে ইংরাজদের যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। বৃটিশ সরকার দেখিল যে, আমেরিকার উপনিবেশগুলি রক্ষা করিবার জন্য যখন তাহাদিগকে এত অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে তখন উপনিবেশগুলিকেও যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের কতকটা অংশ দিতে হইবে। এই অর্থ আদায় করিবার জন্য ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের উপর যে-সকল বিধি-নিষেধ বলবৎ ছিল সেগুলি তাহারা কড়াকড়িভাবে জারি করিতে লাগিল এবং কতকগুলি নূতন করও ধার্য করিল। এ-দিকে উপনিবেশের অধিবাসীরা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে ক্রমশঃ সচেতন ও স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতেছিল। এ-ছাড়া, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজয় হইলে আমেরিকায় ফরাসী আক্রমণের কোন ভয় ছিল না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য উপনিবেশগুলিকে আর ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতে হইত না। এখন তাহারা ইংলণ্ডের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফল—আমেরিকা হইতে কর আদায়ের চেষ্টা—ফরাসী ভীতির অবসান

উপনিবেশগুলি হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য বৃটিশ সরকার নানা-ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বৃটিশ পার্লামেণ্ট উপনিবেশগুলির উপর স্ট্যাম্প অ্যাক্ট্ প্রবর্তন করিয়া কর স্থাপন করিল। আদালতে ব্যবহৃত কাগজপত্র ও দলিলাদির উপর মাশুলের জন্য এই কর ধার্য করা হইয়াছিল; কিন্তু আমেরিকার অধিবাসীরা স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। পরবৎসর এই কর তুলিয়া দিয়া কতকগুলি জিনিসের উপর কর বসান হইল। সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশের লোকেরা সেই সকল জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দিল।

স্ট্যাম্প অ্যাক্ট্ প্রবর্তন

কিন্তু এই কর ধার্যের অধিকার সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে।

উপনিবেশের অধিবাসীরাও ইংরাজ; তাহারা জানে যে, এক পার্লামেণ্ট ছাড়া ইংলণ্ডে আর কেহ কর ধার্য করিতে পারে না এবং সেই পার্লামেণ্ট জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। কিন্তু যে-পার্লামেণ্ট তিন হাজার মাইল দূরে অবস্থিত, যাহার নির্বাচন ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার নাই, সেই পার্লামেণ্ট তাহাদের উপরে কর ধার্য করিবে, ইহা উপনিবেশের লোকেরা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না।

করধার্য সম্বন্ধে মতভেদ

ইংলণ্ডেও এ-বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। পিট্ (চ্যাথাম্), বার্ক প্রভৃতি রাজনীতিকেরা এই কর সমর্থন করিলেন না। পিট্ বলিলেন যে, বৃটিশ পার্লামেণ্টের উপনিবেশের উপর কর ধার্য করিবার কোনই অধিকার নাই। বার্ক বলিলেন, আইনের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই কর ধার্য করিবার কোন উপযোগিতা নাই, ইহাতে আমেরিকানদের উপর অযথা শক্তি প্রয়োগ করা হইতেছে, অথচ কিছুমাত্র লাভ হইতেছে না। এই সকল আলোচনার ফলে এবং কর ধার্য করিয়া টাকা আসিতেছে না, অথচ লোকের অসন্তোষ বাড়িতেছে দেখিয়া ছয় প্রকার করের মধ্যে পাঁচটি উঠাইয়া দেওয়া হইল। বৃটিশ পার্লামেণ্টের যে কর ধার্য করিবার অধিকার আছে ইহা দেখাইবার জন্যই চা-এর উপরে তখনও শুল্ক বজায় রাখা হইল।



এডমাণ্ড বার্ক

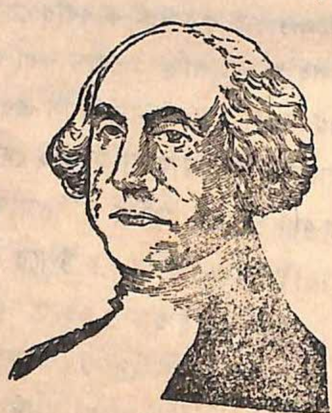
এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে আগত দুইটি চা-বোঝাই জাহাজ আমেরিকার বোস্টন বন্দরে আসিয়াছিল। একদল আমেরিকান যুবক আদিম অধিবাসীদের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠিয়া চায়ের বাক্সগুলি জলে ভাসাইয়া দিল। বোস্টনের লোকদিগকে সাজা দিবার জন্য কঠোর দমননীতির ব্যবস্থা হইল। শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনের জন্য সৈন্য পাঠান হইল। উপনিবেশের লোকেরা সেই সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল এবং এইভাবে যুদ্ধ শুরু হইল।

বোস্টনের হাঙ্গামা

সাফল্যের কারণ : পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সাফল্য স্বভাবতঃই বিস্ময়কর। এই যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের তিনটি প্রধান কারণ ছিল—(১) আমেরিকার ভৌগোলিক প্রকৃতি ; (২) সেনাপতি ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব ও (৩) ইউরোপীয় জোটের অবদান।

(১) আমেরিকার ভৌগোলিক প্রকৃতি যুদ্ধে খুবই সাহায্য করিয়াছিল। আমেরিকার উপনিবেশগুলি বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ লইয়া বিস্তৃত ছিল, ভাল রাস্তা ছিল না। সুতরাং অত্যধিক সংখ্যক সৈন্য না থাকিলে সমগ্র দেশ দখলে রাখা অসম্ভব ছিল। সাধারণতঃ ইহা বলা হইয়া থাকে যে, "আমেরিকানগণ প্রত্যেকটি যুদ্ধে হারিয়াছে, কিন্তু সমগ্র সমরে জয়লাভ করিয়াছে।" ইহার অর্থ এই যে, একটি ক্ষুদ্র জনবহুল দেশ যে-ভাবে জয় করা যায় আমেরিকান উপনিবেশের মত এইরূপ সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল সেইভাবে জয় করা সম্ভব নয়।

(২) ঔপনিবেশিকগণের প্রধান সেনাপতি ওয়াশিংটন ছিলেন সৎ, নির্ভীক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াও তিনি কখন আশা ছাড়িয়া দেন নাই, প্রত্যেক পরাজয়কে তিনি আগামী দিনের বিজয়ে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন।


ওয়াশিংটন

(৩) ফ্রান্স ও তৎসহ স্পেন ও হল্যাণ্ড ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল অংশে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল। এই সর্বব্যাপী আক্রমণের ফলে ইংরাজ সৈন্যকে একসঙ্গে বহু স্থানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আমেরিকায় তাহাদের যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি তীব্র আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

ফলাফল : আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল ছিল ব্যাপক

ও সুদূরপ্রসারী। স্বাধীনতালাভের ফলে আমেরিকা ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতঃই এই অগ্রগতির সূচনা হইয়াছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে সাফল্যের ফলে।

ইতিপূর্বে স্বৈরাচারী বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই ছিল ইউরোপের প্রচলিত রাজনৈতিক আদর্শ। কিন্তু ঔপনিবেশিকগণ গতানুগতিক রাজনৈতিক আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া জনগণ কর্তৃক শাসিত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিবার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই ইংলণ্ডের খ্যাতি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এই কারণে ইংলণ্ডের রাজার প্রতি সেখানকার জনসাধারণের আস্থা কমিয়া গিয়াছিল। ফলে রাজার "ব্যক্তিগত শাসনের" নীতি পরিত্যক্ত হইল।

আমেরিকাবাসীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাফল্যের কাহিনী অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই ঘটনা ফরাসী জাতির সম্মুখে বিপ্লবের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল।

(খ) ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব

সূচনা : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডে প্রথম শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হয়। ঐ সময় কয়েকটি যুগান্তকারী যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সমগ্র শিল্প ও উৎপাদন প্রণালীর যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা 'শিল্প-বিপ্লব' নামে পরিচিত। পূর্বে শিল্পী ও কারিগরেরা প্রধানতঃ দৈহিক শক্তির সাহায্যে স্বাধীনভাবে জিনিসপত্র তৈয়ারি করিত। যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জামের অভাব ছিল এবং সেই কারণে উৎপাদন ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু এক্ষণে শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার প্রবর্তিত হইলে স্বল্পব্যয়ে এবং অল্প সময়ে অধিকতর উৎপাদন সম্ভব হইল। অনেকে আবার উৎপাদন প্রণালী ও যানবাহন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে শিল্প-বিপ্লব আখ্যা দিয়াছেন।

ইহার অর্থ

কৃষি-বিপ্লব : শ্রমশিল্পে বিপ্লব আরম্ভ হইবার পূর্বেই ইংলণ্ডে কৃষিকার্যে

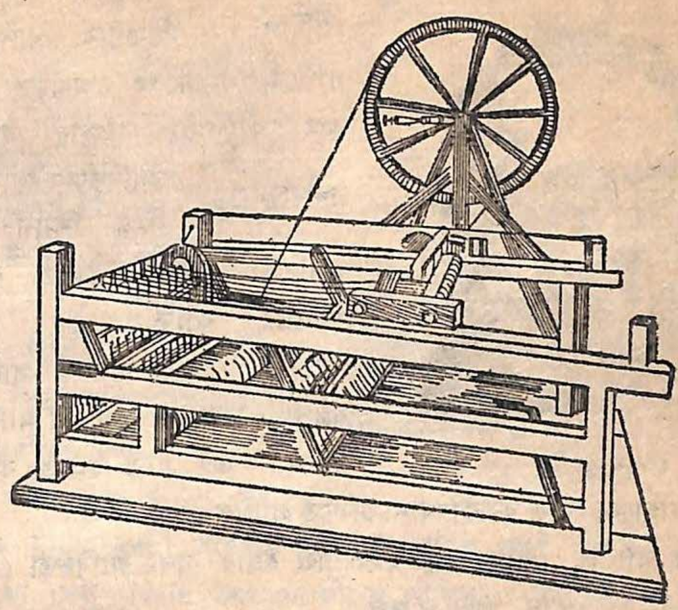
যুগান্তর শুরু হইয়াছিল। পূর্বে চাষের জমি প্রতি তিন বৎসরে এক বৎসর করিয়া পতিত রাখা হইত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জমি পতিত রাখিবার ব্যবস্থা উঠিয়া গেল। তাহার পরিবর্তে একই ধরনের শস্য না বুনিয়া মাঝে মাঝে জমিতে মূল-জাতীয় ফসলের চাষ হইতে লাগিল। তাহাতে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইল। গবাদি পশুর প্রজননের জন্য বিদেশ হইতে ষাঁড়, মেষ ও ঘোড়া আমদানি করা হইয়াছিল। পূর্বে একটি ষাঁড়ের ওজন হইত সাধারণতঃ ৩৭০ পাউণ্ড, এক্ষণে সেই ওজন ৮০০ পাউণ্ড হইল। এ-ছাড়া, গবাদি পশু যাহাতে শীতকালে বাঁচিয়া থাকে সেজন্যও অনেক ঔষধপত্র আবিষ্কৃত হয়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল জমিতে সারের ব্যবহার। ইহার ফলে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু উন্নত প্রণালীতে চাষ করা সহজ নহে। ইহাতে বুদ্ধি, সাহস ও মূলধনের প্রয়োজন। সুতরাং ছোট ছোট গরীব চাষীরা চাষের উন্নত প্রণালী কাজে লাগাইতে পারিল না। বড় বড় ধনী চাষীরা উন্নত প্রণালীতে চাষ আরম্ভ করিল। তাহারা উচ্চ মূল্য দিয়া গরীব চাষীদের জমি কিনিয়া লইল এবং বহু জমি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া একসঙ্গে চাষ করিতে লাগিল। ক্রমে পতিত জমির সংস্কার এবং ক্ষুদ্র জমির পরিবর্তে বৃহৎ জমি স্থাপিত হইল। স্বভাবতঃই শস্য উৎপাদনের পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ইহার ফলে পল্লী অঞ্চলের রূপ পরিবর্তিত হইল। পূর্বে সামান্য জমি চাষ করিয়া অনেক পরিবার গ্রামাঞ্চলে বাস করিত। এখন তাহারা ভূমি হারাইয়া দিন-মজুরে পরিণত হইল।

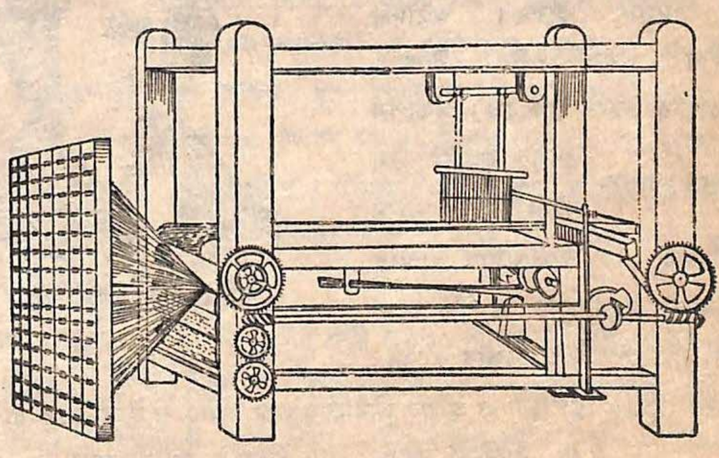
আবিষ্কার ঃ বয়ন-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া সর্বপ্রথম নূতন ধরনের যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন কে নামক এক ব্যক্তি তাঁতের উন্নতি-সাধন করিলেন। এই তাঁতে হাতে মাকু না চালাইয়া যন্ত্রের সাহায্যে মাকু চালান হইত। ইহাতে বয়ন-শিল্পের উন্নতি হইল এবং সেই সঙ্গে সূতার চাহিদা বাড়িয়া গেল। এমতাবস্থায় ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হারগ্রীভস্ 'স্পীনিং জেনি' এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্ক-রাইট 'ওয়াটার ফ্রেম' এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রম্পটন 'মিউল' প্রভৃতি নানা ধরনের চরকা আবিষ্কার করিলে মানুষের সূতা কাটিবার ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া গেল। তখন

বয়ন-শিল্প

দেশের তাঁতীরা এত বেশি সূতা আর বুনিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাই



হারগ্রীভসের স্পিনিং জেনি



কার্টরাইটের কলের তাঁত

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্টরাইট সূতা বুনিবার জন্য 'পাওয়ার লুম' নামে এক উন্নত ধরনের তাঁত আবিষ্কার করিলেন।

এই সময়ে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বাষ্পশক্তির আবিষ্কার। ইতিপূর্বে বাষ্পশক্তি সম্পর্কে অনেকেই অবহিত ছিল এবং কতিপয় বাষ্পীয় ইঞ্জিনও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বাষ্পশক্তি

কিন্তু শিল্প-বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিবার ক্ষেত্রে জেম্স্ ওয়াটের কীর্তি স্মরণীয়। কারণ ওয়াট-ই প্রথম বাষ্পের সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালাইবার কৌশল আবিষ্কার করেন। এই সময় হইতে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে সমস্ত কলকারখানা চলিতে লাগিল।



জেম্স্ ওয়াট

ক্রমে বাষ্পীয় পোত চালু হইল এবং ইহার প্রথম আবিষ্কর্তা ছিলেন রবার্ট ফুলটন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ স্টিভেনসন প্রথম বাষ্প চালিত রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে ইংলণ্ডে রাস্তাঘাটের উন্নতি শুরু হয়। অতঃপর

যানবাহনে যুগান্তর

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে জন ম্যাকাডাম্ নামে স্কটল্যাণ্ডের এক ইঞ্জিনিয়ার রাস্তার উপরিভাগ পাথরকুচি ও পীচ দ্বারা শক্ত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন।

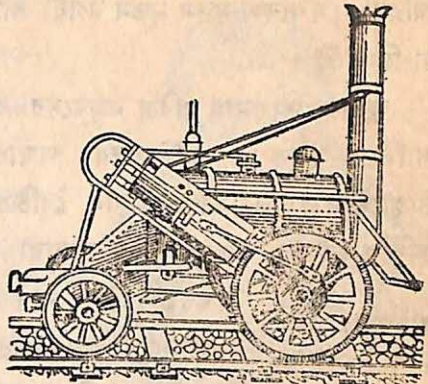


জর্জ স্টিভেনসন

কয়লা ও লৌহ-শিল্প

নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার খুব বাড়িয়া গেল এবং তাহার ফলে কয়লা ও লৌহ-শিল্পে বিপ্লব উপস্থিত হইল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে হাম্‌ফ্রী ডেভি খনির শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য 'নিরাপদ বাতি' আবিষ্কার করেন। ফলে খনির শ্রমিকদের পক্ষে মাটির নীচ হইতে কয়লা

উত্তোলন সম্ভব হইল। মাটির নীচ হইতে জল নিষ্কাশনের জন্য বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য লওয়া হইত। পর্যাপ্ত কয়লার আগুনে লৌহপিণ্ড গলান সম্ভব হইল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন স্মীটন লৌহ গলাইবার চুল্লি আবিষ্কার করেন।



প্রথম রেলইঞ্জিন

ফলাফল : শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের উৎপাদন শক্তি ও ধনসম্পদ বাড়িয়া গেল। পূর্বে হাতে কাজ করিয়া এক হাজার মানুষ যতটা পরিমাণ উৎপাদন করিত এখন একটি মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে সেই পরিমাণ উৎপাদন করিতে লাগিল। দেশ-বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থাগম হইল। রেলগাড়ি ও স্টীমার নির্মাণের ফলে অন্তর্বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার হইল। বিপ্লবী ফ্রান্স ও নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের ছয় শত কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। একশত বৎসর আগে হইলে ইংলণ্ড কখনই এত টাকা খরচ করিতে পারিত না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের এত উন্নতি ও প্রসার হইয়াছিল যে, এত টাকা খরচ করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

উৎপাদন ও ধনবৃদ্ধি

শিল্প-বিপ্লবের ফলে কারখানার সৃষ্টি হয়। আগে বাড়িতে বসিয়া লোকে সূতা কাটিত ও কাপড় বুনিত। কিন্তু কলের চরকা ও তাঁত আবিষ্কারের পরে এত সহজে ও সস্তায় ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল যে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় হাতের তাঁত ও চরকা উঠিয়া গেল। তাঁতীরা ও কারিগরেরা সাধারণ দিন-মজুরে পরিণত হইল। কয়লাখনি এলাকায় ও অন্যান্য উপযোগী স্থানে নূতন নূতন কারখানা গড়িয়া উঠিল। সবুজ পল্লীভূমি কারখানায় রূপান্তরিত হইল। কারখানার

কারখানা-ভিত্তিক জীবন

চাষীরা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ এবং দেশের মধ্যে বিদ্রোহ এই উভয় সংকটে কঠোর শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন হইল। বারজন লোক লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটির হাতে ফ্রান্সের সমস্ত লোকের উপর যথেচ্ছ শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।

সন্ত্রাসের রাজত্বকাল

চরমপন্থী শাসনের এই পর্যায়কে 'সন্ত্রাসের রাজত্বকাল' বলা হয়। এই সময় রোবসপিয়র নামক এক নেতা শাসনব্যবস্থার শীর্ষে উঠেন। যে কেহ তাঁহার শাসনের অণুমাত্র বিরোধিতা করিত বা যাহাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইত, তাহাকেই হত্যা করা হইত। অপরাধীদের যত তাড়াতাড়ি বিচার হইত ততোধিক তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে গিলোটিন নামক নবাবিষ্কৃত ক্ষিপ্র মারণাস্ত্র দিয়া নিহত করা হইত। এইরূপে সহস্রাধিক লোককে হত্যা করা হইল। শেষে প্রত্যেকের মনে সন্দেহ হইল এইবার বুঝি তাহার মরিবার পালা আসিতেছে। সুতরাং সকলে রোবসপিয়রের বিরুদ্ধে গিয়া তাঁহাকেই গিলোটিন দিয়া হত্যা করিল।



রোবসপিয়র

রোবসপিয়রের উত্থান ও পতন

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেশের শাসনভার পাঁচজন ডিরেক্টরের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। মূলতঃ সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোনমতে টিকিয়া ছিলেন। তাহাদের ব্যর্থতার সুযোগে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি নামক এক নবীন ফরাসী সেনাপতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্ণধার হইলেন।

অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে সাফল্য

(২) **নেপোলিয়ন:** ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের অধিকৃত কার্সিকা দ্বীপে নেপোলিয়নের জন্ম হয়। তিনি ফরাসী সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ নৌ-আক্রমণ হইতে তুলোঁ বন্দর এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উচ্ছৃঙ্খল জনতার

আক্রমণ হইতে প্রতিনিধি সভাকে রক্ষা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। অতঃপর ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী ফ্রান্সের হইয়া ইতালিতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অস্ট্রিয়ার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করেন। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এখন ফ্রান্সের একমাত্র শত্রু রহিল ইংলণ্ড। কিন্তু সরাসরি ইংলণ্ড আক্রমণ না করিয়া মিশর আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইল। কারণ মিশরের মধ্য দিয়া ইংলণ্ডের শক্তি ও অর্থের উৎস ভারতের উপর আঘাত হানা সহজ হইত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে প্রথমে পিরামিডের যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়ী হন। কিন্তু অচিরেই বৃটিশ সেনাপতি নেলসনের সঙ্গে নীলনদের যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর বিধ্বস্ত হইয়া গেল (আগস্ট, ১৭৯৮ খ্রীঃ)। নেপোলিয়ন বাধ্য হইয়া ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ডিরেক্টরদের ক্ষমতাচ্যুত করিয়া কনস্যুলেট নামক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী নেপোলিয়ন হইলেন প্রথম কনসাল।

নীলনদের যুদ্ধে পরাজয়



নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন ও ইউরোপ : ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন যাবজ্জীবন কনসাল নিযুক্ত হন এবং ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। অচিরেই ইংলণ্ডের সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধ শুরু হইল। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাফালগারের যুদ্ধে ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসন ফরাসী ও স্পেনীয় যুগ্ম নৌবহর আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিলে সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। স্থলভাগে ইংরাজেরা অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া এই তিন শক্তিকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া তুলিল। নেপোলিয়ন কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই তিন শক্তিকেই হারাইয়া

যুদ্ধে, প্রাশিয়াকে জেনার যুদ্ধে এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াকে ফ্রিড্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন রাশিয়াকে ক্ষুব্ধ রাখিতে চাহিলেন না। তাই টিল্‌সিটের সন্ধি (১৮০৭ খ্রীঃ) দ্বারা ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ইউরোপ ভাগাভাগি করিবার পরিকল্পনা রচিত হইল।

টিল্‌সিটের সন্ধিতে ফরাসী সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার ঘটে। কিন্তু স্থলভাগে নেপোলিয়ন একচ্ছত্র হইলেও সমুদ্রবক্ষে বৃটিশ নৌবাহিনীর একাধিপত্য সুদৃঢ় হইয়াছিল। সুতরাং নেপোলিয়ন পরোক্ষভাবে ইংলণ্ডের উপর আঘাত হানিতে চাহিলেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' চালু করা হইল। স্থির হইল যে, ইউরোপের কোন দেশ ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিতে পাইবে না। এই ব্যবস্থা স্বভাবতঃই বৃটিশ অর্থনীতিকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইউরোপের দেশগুলিও বৃটিশ পণ্যের অভাবে আর্থিক বিপাকে পড়িয়াছিল। এমন কি, ফ্রান্সের অভ্যন্তরে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিল।

টিল্‌সিটের সন্ধি ও মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা

এই সময় নেপোলিয়ন একটি মারাত্মক ভুল করেন। তিনি স্পেনের রাজাকে সরাইয়া আপন ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৮০৮ খ্রীঃ)। কিন্তু স্পেনের লোকে এইরূপে স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজী হইল না। তাহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই পরিস্থিতির সুযোগে ইংলণ্ড স্পেনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে 'উপদ্বীপের যুদ্ধে'র সূচনা হইল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন ও পর্তুগাল হইতে ফরাসীরা বিতাড়িত হইলে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। স্থলযুদ্ধে ইহাই হইল নেপোলিয়নের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরাজয়।

স্পেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ—উপদ্বীপের যুদ্ধ

ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন আর একটি ভুল করিলেন; ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল সৈন্যসহ তিনি রাশিয়া আক্রমণ করিলেন। রাশিয়ার সৈন্যদল যুদ্ধ করিল না, ইচ্ছাপূর্বক পিছু হটিতে লাগিল। নেপোলিয়ন অবাধে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো নগরী দখল করিলেন।

মস্কো অভিযানে সৈন্য ধ্বংস

নগরে আগুন লাগাইয়া দিল। শেষে খাদ্যাভাবে নেপোলিয়নকে ফিরিতে হইল এবং ফিরিবার পথে অনাহারে, দারুণ শীতে ও কসাক অশ্বারোহী বাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণে ফরাসী বাহিনী বহুলাংশে বিধ্বস্ত হইল। সুযোগ

পরাজয় ও সিংহাসন ত্যাগ

বুঝিয়া অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি সম্মিলিত হইয়া ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইপ্‌জিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের শক্তি বিধ্বস্ত করিল। পর বৎসর নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং ভূমধ্যসাগরস্থ এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হইলেন।

পরাজয় ও নির্বাসন: চৌদ্দ মাসের মধ্যেই নেপোলিয়ন গোপনে এল্‌বা দ্বীপ হইতে পলাইয়া আসিয়া ফ্রান্সে উপস্থিত হইলেন (মার্চ, ১৮১৫ খ্রীঃ)। দেখিতে দেখিতে ফ্রান্সের লোক আবার তাঁহার পতাকার তলায় দাঁড়াইল। আবার ইউরোপে সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নেপোলিয়ন যুদ্ধে

ওয়াটারলুর যুদ্ধ—নেপোলিয়নের নির্বাসন

ইংরাজ ও প্রাশিয়ান সৈন্যদলকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮-ই জুন বেলজিয়ামের অন্তর্গত ওয়াটারলু নামক স্থানে ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইলেন। অতঃপর নেপোলিয়ন প্রথমে ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন এবং অবশেষে ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু এবার আর ফ্রান্সের নিকট নহে, আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী সুদূর সেন্ট্ হেলেনা দ্বীপে তিনি নির্বাসিত হইলেন এবং তথায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৩) **ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল:** ফরাসী বিপ্লবের উচ্চ আদর্শ সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত না হইলেও ইহার যে-সব সুফল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) রাজার স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসন ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধাভোগের উপর প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিপ্লবের নীতির প্রভাবে সেই প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তে উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যুদয় হইয়াছে।

(খ) এই বিপ্লব ফ্রান্সে আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে-কারণে বিপ্লবের উদ্ভব হইয়াছিল সেই কারণ ইউরোপের আর সমস্ত রাজ্যেও বরং অধিক

চিমনির ধোঁয়ায় আশেপাশের চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। কারখানাকে ঘিরিয়া যে-সকল নূতন নূতন নগরী গড়িয়া উঠিল তাহাদের না-ছিল সৌন্দর্য না-ছিল শ্রী।

ক্ষুধার তাড়নায় দরিদ্র মজুরদের বাধ্য হইয়া কারখানায় কাজ করিতে আসিতে হইত। শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বাস করিতে হইত। তাহাদের কাজের মধ্যেও কোন বৈচিত্র্য ছিল না। সর্বদা একঘেয়ে কাজ করিতে হইত। তার উপর তাহারা বরাবর যে কাজ পাইবে তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। যান্ত্রিক উৎপাদনে মানুষের শ্রমের প্রয়োজন কম বলিয়া বেকার-সমস্যা দেখা দিল। সামান্য মজুরীতে স্ত্রীলোক ও শিশুদের কারখানায় নিয়োগ করা হইত। কতক্ষণ কাজ করিতে হইবে তাহার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না, শ্রমিকদের খুব বেশি খাটান হইত। মালিকেরা শ্রমিকদের উন্নতিতে সব রকম বাধা দিত। প্রথমদিকে দেশের সরকার মালিকদের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিত না। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে সরকার শ্রমিক উন্নয়নমূলক কিছু আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কারখানা আইন বিধিবদ্ধ হয়।

শ্রমিকদের দুর্দশা—বেকার-সমস্যা—কারখানা আইন

কারখানার নানা ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের শক্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

(গ) ফরাসী বিপ্লব

(১) **প্রাক্-বিপ্লব চিন্তাধারা**: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স যুদ্ধ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য হারাইলেও জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশে ও দার্শনিক চিন্তাধারায় ইউরোপের মধ্যে অগ্রণী ছিল। মানসিক বিকাশ, উন্নত চিন্তাধারা ও শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে ফরাসী দার্শনিকগণ জ্ঞান জগতে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের রচনাদি পাঠ করিয়া ফরাসী জাতি সচেতন হইয়া উঠে। বিশ্বাস অপেক্ষা যুক্তি জাতির মনে অধিকতর প্রাধান্য পাইতে থাকে।

কয়েকজন বিখ্যাত নেতা : রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রীঃ) : রুশো জেনেভা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং এক বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়া রাজা তৃতীয় জর্জের নিকট হইতে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য দার্শনিক অপেক্ষা রুশোর প্রভাব ছিল অনেক সুদূরপ্রসারী। অন্যান্য দার্শনিক যুক্তিবাদের দোহাই দিতেন, কিন্তু রুশো জনগণের চিত্ত-বৃত্তিতে আঘাত করিতেন। তিনি বলিতেন রাজশক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের করায়ত্ত নহে, একমাত্র সমগ্র জনগণ প্রকৃত রাজশক্তির অধিকারী। সমগ্র জনগণের সাধারণ ইচ্ছাই (general will) রাজার রাজশক্তি। স্বভাবতঃই রুশোর মতে জনসাধারণই হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি। রুশোর প্রধান গ্রন্থ 'সামাজিক চুক্তিবাদ'।


রুশো

ভল্‌তেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রীঃ) : ভল্‌তেয়ার অসংখ্য কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা করিয়া অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। শ্লেষ ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় তিনি প্রচলিত অন্যায়, অত্যাচার ও কুসংস্কারকে তীব্র আঘাত হানিয়াছিলেন। প্রচলিত ধর্ম ও চার্চকে তিনি প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সার্ফ প্রথা এবং সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকার অবসানেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ভল্‌তেয়ার জনগণের শাসন সমর্থন করিতেন না। পক্ষান্তরে তিনি রাজতান্ত্রিক শাসন সমর্থন করিতেন। রাজা স্বভাবতই


ভল্‌তেয়ার

ইচ্ছামত শাসন করিবেন তবে সেই সঙ্গে তিনি সমাজ হইতে অন্যায় ও অনাচার বিদূরিত করিয়া জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবেন।

মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রীঃ) ঃ মন্টেস্কু ছিলেন একজন ফরাসী আইনজীবী। জীবনে তিনি দুই বৎসর ইংলণ্ডে বাস করেন এবং ইংরাজদিগের শাসনতন্ত্র ও ভাবধারার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে জনগণের চরিত্র ও প্রয়োজনের সঙ্গে যাহাতে মিল খায় এইরূপ শাসনতন্ত্র গঠিত হওয়া উচিত। তাঁহার রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'Spirit of the Laws'। বৃটিশ শাসন প্রণালীতে শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাঁহার মতে এই পৃথকীকরণই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। স্বভাবতঃই তিনি ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রশংসা করেন এবং ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন।

বিপ্লবের কারণ ঃ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়। এই বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ আকস্মিক হইলেও এই বিপ্লব হঠাৎ ঘটে নাই। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নানাবিধ অভিযোগ ইহার পশ্চাতে ইন্ধন জোগাইয়াছিল। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহার কারণগুলি মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও দার্শনিক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব।

রাজনৈতিক কারণ ঃ বিপ্লবের যুগে ফরাসী রাজতন্ত্র স্বৈরাচারী ছিল। রাজা মনে করিতেন যে, 'ঈশ্বরদত্ত' ক্ষমতা বলে তিনি রাজ্য শাসনের অধিকারী। লোকের জীবন ও সম্পত্তি লইয়া রাজা যাহা খুশি তাহাই করিতে পারিতেন। যে-কোন লোককে তিনি বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। কর স্থাপন ও আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল রাজার হাতে। এমতাবস্থায় যোগ্য ব্যক্তি রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তেমন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ফরাসীরাজ যোড়শ লুই ছিলেন অকর্মণ্য ও ব্যক্তিত্বহীন। ফলে ফরাসী রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়।

সামাজিক কারণ ঃ ফরাসী সমাজ প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল ; উচ্চতম স্তরে ছিল যাজক শ্রেণী। দ্বিতীয় স্তর সামন্ত শ্রেণী বা অভিজাত সম্প্রদায়। তৃতীয় স্তর ছিল ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, বড় বড় ব্যবসায়ী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি নিম্নবিত্ত সাধারণ

লোক। এই সমাজ-ব্যবস্থার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের উচ্চবিত্তগণ নানা ধরনের সুবিধা ভোগ করিত এবং সর্বোপরি তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ কর দিতে হইত না, যদিও তাহারাই দেশের ভূসম্পত্তির অধিকাংশই ভোগ করিতে-ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্যশক্তিতে যাজক বা অভিজাত সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সমাজে তাহাদের বিশেষ কদর ছিল না। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক ক্ষমতালাভের আন্দোলনের ফলেই হইয়াছিল। তাই বিপ্লবের শুরুতে বিপ্লবিগণ রাজশক্তির অবসান না ঘটাইয়া উচ্চবিত্তদের বিশেষ অধিকারসমূহের বিলোপ করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক কারণ : অর্থনৈতিক কারণ প্রসঙ্গে এ-কথা প্রথমেই উল্লেখ্য যে, বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী দেশের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল না, কিন্তু রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। রাজকোষে অর্থাভাবের অনেক কারণ ছিল। প্রথমত, রাজা অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং উচ্চবিত্তদের কাহাকেও কোন প্রত্যক্ষ কর দিতে হইত না। সুতরাং তৃতীয় স্তরের লোকজন যাবতীয় করের বোঝা বহন করিত। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সে ঠিকাদারি প্রথায় কর আদায় হইত এবং এই কর আদায়ের ক্ষেত্রে এত গলদ ছিল যে, অর্ধেক টাকা রাজকোষে পৌঁছিত না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের কোন সমতা ছিল না এবং ঘাটতি সত্ত্বেও ক্রমাগত ঋণ গ্রহণ করিয়া আর্থিক সমস্যার সাময়িক সমাধান করা হইত।

দার্শনিকগণের প্রভাব : ফরাসী দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন মণ্টেস্কু, ভল্‌তেয়ার ও রুশো। এ-ছাড়া, দিদেরো এবং এ-লেমবার্ট নামক দুই জন দার্শনিক ও 'ফিজিওক্রাট' নামে এক শ্রেণীর অর্থ-নীতিবিদের অবদান উল্লেখযোগ্য। মণ্টেস্কু বৃটিশ শাসনপ্রণালীতে শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ দেখিয়া মুগ্ধ হন। সেইমত তিনি ফ্রান্সেও রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ চাহিয়াছিলেন। ভল্‌তেয়ার প্রচলিত যাবতীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের বিলোপ সাধনে আগ্রহী ছিলেন। তবে তিনি জনগণের শাসন অপেক্ষা প্রজাহিতৈষী রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। রুশো সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। তিনি বলিতেন সকল মানুষ জন্মে স্বাধীন, কিন্তু বাস্তব জীবনে সর্বত্র তাহারা শৃংখলাবদ্ধ। তাঁহার জনসাধারণের সার্ব-ভৌমত্বের মতবাদ ফরাসী বিপ্লবে ইন্ধন যোগাইয়াছিল।

দিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্ম বাহিনীকে অস্টারলিজের যুদ্ধে, প্রাশিয়াকে জেনার যুদ্ধে এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াকে ফ্রিড্ল্যাণ্ডের যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন রাশিয়াকে ক্ষুব্ধ রাখিতে চাহিলেন না। তাই টিল্সিটের সন্ধি (১৮০৭ খ্রীঃ) দ্বারা ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ইউরোপ ভাগাভাগি করিবার পরিকল্পনা রচিত হইল।

টিল্সিটের সন্ধি ও মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা

টিল্সিটের সন্ধিতে ফরাসী সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার ঘটে। কিন্তু স্থলভাগে নেপোলিয়ন একচ্ছত্র হইলেও সমুদ্রবক্ষে বৃটিশ নৌবাহিনীর একাধিপত্য সুদৃঢ় হইয়াছিল। সুতরাং নেপোলিয়ন পরোক্ষভাবে ইংলণ্ডের উপর আঘাত হানিতে চাহিলেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' চালু করা হইল। স্থির হইল যে, ইউরোপের কোন দেশ ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিতে পাইবে না। এই ব্যবস্থা স্বভাবতঃই বৃটিশ অর্থনীতিকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইউরোপের দেশগুলিও বৃটিশ পণ্যের অভাবে আর্থিক বিপাকে পড়িয়াছিল। এমন কি, ফ্রান্সের অভ্যন্তরে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিল।

স্পেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ—উপদ্বীপের যুদ্ধ

এই সময় নেপোলিয়ন একটি মারাত্মক ভুল করেন। তিনি স্পেনের রাজাকে সরাইয়া আপন ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৮০৮ খ্রীঃ)। কিন্তু স্পেনের লোকে এইরূপে স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজী হইল না। তাহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই পরিস্থিতির সুযোগে ইংলণ্ড স্পেনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে 'উপদ্বীপের যুদ্ধে'র সূচনা হইল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন ও পর্তুগাল হইতে ফরাসীরা বিতাড়িত হইলে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। স্থলযুদ্ধে ইহাই হইল নেপোলিয়নের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরাজয়।

মস্কো অভিযানে সৈন্য ধ্বংস

ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন আর একটি ভুল করিলেন; ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল সৈন্যসহ তিনি রাশিয়া আক্রমণ করিলেন। রাশিয়ার সৈন্যদল যুদ্ধ করিল না, ইচ্ছাপূর্বক পিছু হটিতে লাগিল। নেপোলিয়ন অনায়াসে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো নগরী দখল করিলেন।

নগরবাসীরা পূর্বেই নগর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা মস্কো নগরে আগুন লাগাইয়া দিল। শেষে খাদ্যাভাবে নেপোলিয়নকে ফিরিতে হইল এবং ফিরিবার পথে অনাহারে, দারুণ শীতে ও কসাক অশ্বারোহী বাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণে ফরাসী বাহিনী বহুলাংশে বিধ্বস্ত হইল। সুযোগ বুঝিয়া অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি সম্মিলিত হইয়া ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইপ্‌জিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের শক্তি বিধ্বস্ত করিল। পর বৎসর নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং ভূমধ্যসাগরস্থ এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হইলেন।

পরাজয় ও সিংহাসন ত্যাগ

পরাজয় ও নির্বাসন: চৌদ্দ মাসের মধ্যেই নেপোলিয়ন গোপনে এল্‌বা দ্বীপ হইতে পলাইয়া আসিয়া ফ্রান্সে উপস্থিত হইলেন (মার্চ, ১৮১৫ খ্রীঃ)। দেখিতে দেখিতে ফ্রান্সের লোক আবার তাঁহার পতাকার তলায় দাঁড়াইল। আবার ইউরোপে সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নেপোলিয়ন যুদ্ধে ইংরাজ ও প্রাশিয়ান সৈন্যদলকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন বেলজিয়ামের অন্তর্গত ওয়াটারলু নামক স্থানে ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইলেন। অতঃপর নেপোলিয়ন প্রথমে ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন এবং অবশেষে ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু এবার আর ফ্রান্সের নিকট নহে, আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী সুদূর সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপে তিনি নির্বাসিত হইলেন এবং তথায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ওয়াটারলুর যুদ্ধ—নেপোলিয়নের নির্বাসন

(৩) ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল: ফরাসী বিপ্লবের উচ্চ আদর্শ সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত না হইলেও ইহার যে-সব সুফল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) রাজার স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসন ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধাভোগের উপর প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিপ্লবের নীতির প্রভাবে সেই প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তে উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যুদয় হইয়াছে।

(খ) এই বিপ্লব ফ্রান্সে আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে-কারণে বিপ্লবের উদ্ভব হইয়াছিল সেই কারণ ইউরোপের আর সমস্ত রাজ্যেও বরং অধিক

পরিমাণ বর্তমান ছিল। সুতরাং বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ফ্রান্সের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র বিস্তৃত হইল এবং ইউরোপের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার প্রভাব কার্যকরী হইল। পুরাতন শাসনব্যবস্থা লোকে আর সহজে মানিয়া লইতে রাজী হইল না, ফলে সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের রাজনীতিতে নানারূপ বিপ্লব ও পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল।

(গ) ফরাসী বিপ্লবে যে-সব নূতন মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল উহাদের মধ্যে একটি মতবাদ এই ছিল যে, প্রত্যেক জাতিরই নিজের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র থাকিবে। এই মতবাদ এখন জগতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। এই মতবাদের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের দুইটি শক্তিশালী বড় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়—একটি ঐক্যবদ্ধ ইতালি, অপরটি ঐক্যবদ্ধ জার্মানী।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যুক্তিবাদের প্রাধান্য—ইউরোপের মূক জনতার মধ্যে বিদ্রোহী ভাব—তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা।

২. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ উত্তর আমেরিকার তেরটি উপনিবেশের অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক কর ধার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং যুক্তির অবতারণা।

৩. স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের সাফল্য, জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব —আমেরিকায় জনগণ কর্তৃক শাসিত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৪. অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব—উৎপাদন প্রণালীর আমূল পরিবর্তন, অল্প সময়ে অধিকতর উৎপাদন। বয়ন-শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নূতন নূতন আবিষ্কার। কলকারখানার অবির্ভাব, শ্রমিক সমস্যা।

৫. ফরাসী বিপ্লব: প্রাক-বিপ্লব পর্যায়, মানবিক বিকাশ, উন্নত চিন্তাধারা, দার্শনিকদের রচনা।

৬. বিপ্লবের কারণ, সূচনা বাস্তিলের পতন, সংবিধান সভার কার্যকলাপ।

৭. অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং বহিরাগত আক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বকাল। সন্ত্রাসের নেতা রোবসপিয়রের পতন, ডিরেক্টর সভার ব্যর্থতা।

৮. নেপোলিয়নের আবির্ভাব—রাজ্যজয়। সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়নের প্রাধান্য বিস্তার। ওয়াটারলু'র যুদ্ধ—শেষ পরাজয় ও মৃত্যু।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি ও কারণ বিশ্লেষণ কর। ২। ইংলণ্ডে কৃষি-সংক্রান্ত বিপ্লব ও উহার ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৩। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সহিত সংশ্লিষ্ট আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৪। শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল কি হইয়াছিল? ৫। প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা কর। ৬। ফরাসী বিপ্লবের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৭। ফরাসী বিপ্লবের গতি ও প্রসার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৮। কিভাবে নেপোলিয়ন ইংলণ্ড তথা ইউরোপের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন? ৯। নেপোলিয়নের পতনের পশ্চাতে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা, স্পেনের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ও রাশিয়া আক্রমণ কোন্‌টি কার্যকরী ভূমিকা লইয়াছিল? ১০। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকানদের সাফল্যের কারণ কি ছিল? (২) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। (৩) শিল্প-বিপ্লব কাহাকে বলে? (৪) ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক কারণ বলিতে কি বুঝ? (৫) সন্ত্রাসের রাজত্বকাল কাহাকে বলা হইত? (৬) কিভাবে নেপোলিয়নের উত্থান হইয়াছিল? (৭) মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝ? (৮) কোন্ যুদ্ধে এবং কিভাবে নেপোলিয়নের শেষ পরাজয় ও নির্বাসন সম্ভব হইয়াছিল?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও : (ক) আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে উত্তর আমেরিকার উপকূলভাগে কয়টি উপনিবেশ ছিল? (খ) ঔপনিবেশিকগণের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? (গ) জেমস্ ওয়াট্ কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন? (ঘ) রুশোর প্রধান গ্রন্থের নাম কি? (ঙ) ভল্‌তেয়ার কি ধরনের শাসনব্যবস্থা পছন্দ করিতেন? (চ) ফরাসী বিপ্লবের সময় কে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন? (ছ) সন্ত্রাসের রাজত্বকালে কে শাসনব্যবস্থার শীর্ষে উঠিয়াছিলেন? (জ) নেপোলিয়ন কোন্ দেশের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা চালু করিয়াছিলেন? (ঝ) কোন্ যুদ্ধে নেপোলিয়নের শেষ পরাজয় ঘটিয়াছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) আমেরিকায় ইংরাজগণ সেখানকার আদিম অধিবাসী — দের তাড়াইয়া

দিয়াছিল। (২) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে — দের পরাজয় হইলে আমেরিকায় —— আক্রমণের ভীতি দূর হইল। (৩) স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে — বন্দরে একটি চা বোঝাই জাহাজ আসিলে হাঙ্গামা বাধে। (৪) স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকানদের সেনাপতি ছিলেন —। (৫) প্রথম বাষ্পের সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালাইবার কৌশল আবিষ্কার করেন —। (৬) — লোহা গলাইবার চুল্লি আবিষ্কার করেন। (৭) — খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কারখানা আইন বিধিবদ্ধ হয়। (৮) — বলিয়াছেন যে সমগ্র জনগণের সাধারণ ইচ্ছাই (General Will) রাজার রাজশক্তি। (৯)' বিপ্লবের সময় — ফরাসী দেশের রাণী ছিলেন। (১০) রাজা স্টেট্‌স্ জেনারেল বন্ধ করিয়া দিলে জনগণের প্রতিনিধিরা নিকটবর্তী — মাঠে সমবেত হয়। (১১) সন্ত্রাসের রাজত্বকালে — ক্ষমতার শীর্ষে উঠেন। (১২) ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে — সন্ধিতে ফরাসী সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার ঘটে। (১৩) নেপোলিয়ন — রাজাকে সরাইয়া আপন ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসান।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও ঃ

(১) কোন্ যুদ্ধের জন্য অর্থ ব্যয় হইলে উহা আদায় করিবার নিমিত্ত আমেরিকার উপর কর ধার্যের সিদ্ধান্ত হয়? (২) ইংলণ্ডের কোন্ কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি আমেরিকায় কর স্থাপনের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন? (৩) ইংলণ্ডে কখন শিল্প বিপ্লব শুরু হইয়াছিল? (৪) ক্রম্পটন মিউল কি? (৫) জর্জ স্টিভেনসন কিজন্য বিখ্যাত? (৬) কে খনির শ্রমিকদের জন্য 'নিরাপদ বাতি' আবিষ্কার করেন? (৭) মণ্টেস্কুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কি? (৮) ফরাসী সমাজ কোন্ কোন্ স্তরে বিভক্ত ছিল? (৯) কি কারণে ফরাসীরাজ স্টেট্‌স্ জেনারেলের অধিবেশন আহ্বানে বাধ্য হন? (১০) টিলজিটের সন্ধি কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (১১) কোন্ বৎসর নেপোলিয়ন মস্কো অভিযান করেন? (১৩) কোথায় ওয়াটারলু অবস্থিত? (১৩) নেপোলিয়ন শেষে কোথায় নির্বাসিত হন?

নবম অধ্যায়

১৮১৫ সাল হইতে ইউরোপের ইতিহাস

(ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি : নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরে ইউরোপের পুনর্গঠন ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিজয়ী শক্তিবর্গ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে সম্মিলিত হন। ইহার ফলে যে সাধারণ বৈঠক বসে তাহা ভিয়েনা কংগ্রেস নামে পরিচিত। অস্ট্রিয়ার চান্সেলার প্রিন্স মেটারনিক এই বৈঠকে সভাপতি ছিলেন। বৈঠকে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের প্রাধান্য ছিল। এই সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কেহই ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত চিন্তাধারা তথা গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের ধার ধারিতেন না। তাঁহারা সব ব্যবস্থাই ফরাসী বিপ্লবের আগেকার মতই রাখিয়া দিতে চাহিলেন। সেইমত ন্যায্য অধিকার নীতির প্রয়োগ করিয়া ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যে-রাজ্যে যে-রাজবংশ রাজত্ব করিত তাহা সেই রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইল। এমন কি, ভিয়েনা কংগ্রেসের সমাপ্তির পর বিপ্লবের আদর্শকে দমন করিতে তথা, ভিয়েনা ব্যবস্থা অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে চতুঃশক্তি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইহাকে ভিত্তি করিয়া সম্মিলিতভাবে বিপ্লব প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে 'ইউরোপীয় শক্তিসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব ব্যবস্থা প্রধানত মেটারনিকের উদ্যোগেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ন্যায্য-অধিকার-নীতি ছিল তাঁহার প্রধান সহায়। তাঁহার দমননীতি কার্যকর করিতে গিয়া ক্রমে ইউরোপীয়

ভিয়েনা কংগ্রেস— অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের প্রাধান্য



প্রিন্স মেটারনিক

ইউরোপীয় শক্তি-সংঘ প্রতিষ্ঠা

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও ঃ

(১) কে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর চ্যান্সেলার ছিলেন ? (২) বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানী কোন্ কোন্ বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়াছিল ? (৩) কাহাদের লইয়া জার্মান বিরোধী জোট গঠিত হইয়াছিল ? (৪) কোন্ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছিল ? (৫) কোন্ বৎসর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ? (৬) কাহাদের লইয়া 'গদর' পার্টি গঠিত হইয়াছিল ? (৭) কিসের অনুকরণে ভারতে হোমরুল আন্দোলন শুরু হয় ? (৮) কাহাদের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রুশ বিপ্লব

সূচনা : বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ঘটনা রাশিয়ার বিপ্লব। অনেকাংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের সহিত তুলনীয় হইলেও মানব সভ্যতার উপর এই বিপ্লবের প্রভাব ছিল আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বস্তুত রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কার্ল মার্কসের চিন্তাধারার সার্থক রূপায়ণের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

বিপ্লবের কারণ : বিভিন্ন কারণে এই বিপ্লবের পটভূমিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রথমত, রাশিয়া স্বৈরাচারী সম্রাটের অধীন ছিল। সম্রাটের উপাধি ছিল জার। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ও গুপ্ত পুলিস বিভাগের সাহায্যে রাশিয়ার জার তাঁহার খুশিমত দেশ শাসন করিতেন। শক্তিশালী জার রাশিয়ার শক্তি বাড়াইয়া তুলিতেন, কিন্তু দুর্বল জারদের শাসনকালে স্বৈরাচারী শাসনের অব্যবস্থা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হইয়া পড়িত।

স্বৈরাচারী জারতন্ত্র

রাশিয়ার যেমন এক দুর্বলতা ছিল স্বৈরাচারী শাসন, তেমনি আর এক দুর্বলতা ছিল জাতীয়তা সমস্যা। সুবিশাল রুশ সাম্রাজ্যে নানা জাতির লোক বাস করিত। রুশ জাতি ছাড়াও অন্য স্লাভ জাতি ছিল—যেমন, পোল। স্লাভ ছাড়াও অন্য জাতি ছিল—যেমন, ফিণ। রাশিয়া তাহার সাম্রাজ্যের সব জাতির উপর ভাল ব্যবহার করিত না; তাহাদিগকে আদালতে ও বিদ্যালয়ে আপন আপন ভাষা ব্যবহার করিতে দিত না, এমন কি, নিজের ধর্মাচরণ করিতেও বাধা দিত।

জাতীয়তা সমস্যা

রাশিয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যেরও অন্ত ছিল না। ইউরোপের মধ্যে রাশিয়া ছিল সর্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশ। ভূ-স্বামীরাই দেশে প্রভুত্ব করিতেন। দেশের অধিকাংশ জনগণ ছিল চাষী। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল অতি গরীব ও নিরক্ষর। জারের শাসনকালে দেশের শ্রমশিল্পের কোনরূপ উন্নতি হয় নাই।

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অসন্তোষ

শক্তিসংঘ প্রতিক্রিয়াশীল যন্ত্রে পরিণত হইল। যে-কোন দেশে বিপ্লব ঘটিলে সেই দেশে শক্তিসংঘের হস্তক্ষেপের আইন চালু হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থা সত্বেও সময়ের গতিকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় নাই। তাই উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে ভিয়েনা ব্যবস্থা ভাঙ্গিবার ইতিহাস হিসাবে গণ্য করা হয়।

(খ) **১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপ :** ১৮১৫ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই প্রবল ছিল বলিয়া ঐ সময়ের মধ্যে গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদী আদর্শ পরাভূত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় বিপ্লবের চেতনা ইউরোপের জনগণের অন্তরে সদাজাগ্রত ছিল। স্বভাবতঃই জাতীয়তাবাদী আদর্শ ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঐ আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ইতালি রাজ্য গঠিত হয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইতালির ঐক্য আন্দোলন

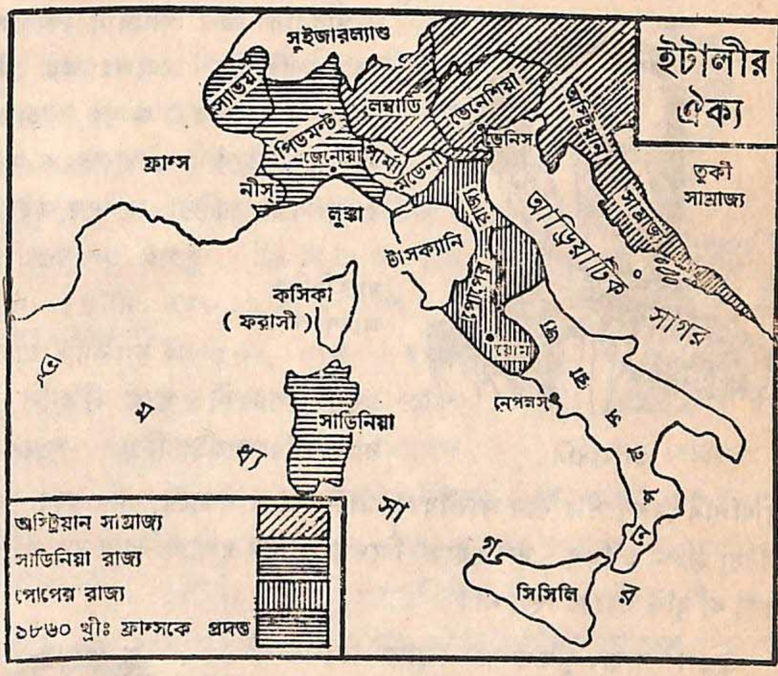
সূচনা : খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালে সমগ্র ইতালি কখনও এক শাসনের অধীনে আসে নাই, কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উত্তরে লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। উত্তর-পশ্চিম কোণের পিডমণ্ট্ প্রদেশ সার্ডিনিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পার্মা, মডেনা ও টাস্কানিতে অস্ট্রিয়ার রাজবংশীয় কুমারেরা রাজত্ব করিতেন। দক্ষিণ ইতালির নেপ্‌লস্ ও সিসিলিতে স্পেনের বুরবোঁ বংশের কুমারেরা রাজত্ব করিতেন। ইতালির মধ্যভাগ ও রোম নগরী পোপের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সার্ডিনিয়া ছাড়া বাকী সমস্ত খণ্ড রাজ্যে অস্ট্রিয়ার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

নেপোলিয়ন প্রায় সমগ্র ইতালি জয় করিয়া এক শাসনে আনিয়াছিলেন।

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের দান

নেপোলিয়ন ইতালিকে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিতে এবং স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে চাহিলেন। তাঁহার শাসনে ইতালিতে নানাপ্রকার উদার সংস্কার সাধিত হইল। সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কৃষি ও স্বাস্থ্যের

উন্নতির ব্যবস্থা হইল, রাস্তা, সাঁকো প্রভৃতি নির্মিত হইল। এই সময় ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা জনগণের মনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং সকলেই জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল।



নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা বৈঠকে ইতালিকে পূর্বের মত আবার ভাঙ্গিয়া খণ্ড-বিখণ্ড করা হইল। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা স্বৈরতন্ত্র নীতিতে শাসন করিতেন। তাঁহাদের অত্যাচারে দেশে বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ইতালির সর্বত্রই বিদ্রোহ শুরু হইল। পোপকে তাড়াইয়া দিয়া একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রজাতন্ত্রটির উপর চতুর্দিক হইতে আক্রমণ শুরু হইল। এমন কি, বাহির হইতে ফরাসীরা আসিয়া আক্রমণ করিল। বীরের মত লড়িয়াও রোমান প্রজাতন্ত্রের সৈনিকেরা হারিয়া গেল। পোপ আসিয়া আবার তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। জাতীয় জাগরণ ও মুক্তি আন্দোলন তখনকার মত ব্যর্থ হইয়া গেল।

ভিয়েনা বৈঠকের পর ইতালি

নূতন ইতালির গঠনকারিগণ—ম্যাৎসিনি ঃ ইতালির জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ছিলেন ম্যাৎসিনি। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'যুবক ইতালি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়া তিনি দেশের যুবক সম্প্রদায়কে দেশের কাজে লাগাইবার জন্য আহ্বান করিলেন।



ম্যাৎসিনি

তিনি বলিলেন, দেশের জন্য জীবন দিলে স্বাধীনতার কাজ খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবে। ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন ইতালিরাজ্য গড়িয়া তুলিতে হইবে—ইহাই ছিল ম্যাৎসিনির মূল নীতি। তাঁহার এই মূল নীতি প্রচারের ফলেই পরবর্তী কালে ইতালি এক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল।

ম্যাৎসিনির আদর্শবাদ

আদর্শবাদী ম্যাৎসিনি দেশবাসীর মনে জাতীয়তা, স্বাধীনতা ও ঐক্যবোধের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন ; কিন্তু দেশ হইতে বিদেশী শাসন দূর করিবার মত কার্যকরী বিদ্যা বা বুদ্ধি তাঁহার ছিল না।

এরূপ বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট কাভুর।

কাভুর

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সার্ডিনিয়া রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। সার্ডিনিয়া ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। সার্ডিনিয়া দ্বীপ এবং ইতালির উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পিডমণ্ট্ প্রদেশ লইয়া সার্ডিনিয়া রাজ্য গঠিত ছিল। এই সময় সার্ডিনিয়ার রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল। ইনিই ছিলেন ইতালির মধ্যে একমাত্র দেশীয় ও জাতীয় রাজা। বাকী রাজ্যগুলিতে ছিল বিদেশী শাসক। কাভুর



কাউণ্ট কাভুর

কাভুরের কার্যকরী নীতি

বলিলেন, ইতালির একমাত্র জাতীয় রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের নেতৃত্বে সমগ্র ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। সমগ্র ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সার্ডিনিয়ার রাজাকে ঐক্যবদ্ধ নূতন ইতালির রাজা করিতে হইবে। কিন্তু ইহার প্রধান অন্তরায় ছিল বিরাট অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিপুল সামরিক শক্তি।



ভিক্টর ইমানুয়েল

অস্ট্রিয়াকে ইতালি হইতে তাড়াইতে হইলে অস্ট্রিয়ার মতই কোন শক্তিশালী ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কাভুর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪ খ্রীঃ) ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য সার্ডিনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ জয়ের পর মিত্রপক্ষ প্যারিসে মিলিত হইলে কাভুরও নিমন্ত্রিত হইলেন। এই শান্তিবৈঠকে ইতালির সমস্যাও আলোচিত হইল। ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু ঐ বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল না। শেষে কাভুরের সহিত গোপনে চুক্তি হইল যে, অস্ট্রিয়া যদি সার্ডিনিয়াকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে ফ্রান্স সার্ডিনিয়ার পক্ষে যোগ দিবে এবং এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ নীস ও স্যাভয় লাভ করিবে। অতঃপর দেশে ফিরিয়া কাভুর এমনভাবে সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিলেন যে, কিছুদিনের মধ্যে অস্ট্রিয়া সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ফ্রান্সের সাহায্যলাভ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

অষ্ট্রিয়ার পরাজয়

তখন ফরাসীবাহিনী আসিয়া দুইটি যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে হারাইয়া দিল এবং লম্বার্ডি অধিকৃত হইল। কিন্তু ভেনেসিয়া অধিকৃত হইবার পূর্বেই ফ্রান্স হঠাৎ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিল। এদিকে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের সুযোগ লইয়া পার্মা, মডেনা ও টাসকানি বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া সার্ডিনিয়া রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল। এই সময় ম্যাৎসিনির মন্ত্রশিষ্য গ্যারিবল্ডী তাঁহার এক হাজার লাল শার্ট-পরা অনুচরসহ সিসিলি দ্বীপ

গ্যারিবল্ডী

আক্রমণ করিলেন। সিসিলির অধিবাসিগণ তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রো ঘোষণা করিয়া গ্যারিবল্ডীর সহিত যোগ দিল। গ্যারিবল্ডী রাজার বিশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া সিসিলি দ্বীপ অধিকার করিলেন। তারপর সৈন্যবাহিনীসহ নেপ্‌লস্ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া উহাও জয় করিলেন। এই দুইটি রাজ্যই তিনি সার্ডিনিয়ার রাজাকে উপহার দিলেন। এইভাবে ইতালির দক্ষিণ ভাগ নূতন ইতালি রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল, বাকী রহিল কেবল ভেনিস ও রোম। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ বাধিল; সেই সুযোগে ভেনিস অধিকৃত হইল। চার বৎসর পরে প্রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিল। তখন আর ফরাসীবাহিনী পোপকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। সেই সুযোগে রোম অধিকৃত হইল।

সিসিলি ও নেপ্‌লস্ অধিকার—অস্ট্রো-প্রাশিয়া ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধের ফলাফল



গ্যারিবল্ডী

এইভাবে ম্যাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর চেষ্টায় বিচ্ছিন্ন ইতালি এক হইয়া নূতন ইতালি রাজ্য গড়িয়া উঠিল। সার্ডিনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ঐক্যবদ্ধ ইতালি রাজ্যের প্রথম রাজা হইলেন এবং সেখানে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সূচনা: ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মানী তিনশতেরও অধিক ছোট-বড় রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ইহাদের মধ্যে প্রাশিয়া ছিল বড় রাষ্ট্র। জার্মানীর বাকী রাষ্ট্রগুলিতে অস্ট্রিয়া কর্তৃত্ব করিত। অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব নষ্ট করিবার জন্য নেপোলিয়ন দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রগুলি লইয়া 'রাইন রাষ্ট্রসংঘ' গঠন করিলেন এবং ইহার উপর নিজে কর্তৃত্ব করিতে

নেপোলিয়নের দান—রাইন রাষ্ট্রসংঘ গঠন

রক্ষাগলেন ; প্রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখিবার জন্য প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় উইলিয়মকে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘে কর্তৃত্ব করিতে দিলেন।

এই সময় প্রাশিয়ার মন্ত্রী ছিলেন ব্যারণ বম্‌স্টাইন। তিনি দেখিলেন, ফরাসী বিপ্লবের নূতন ভাবধারা ও সামাজিক সংস্কারের ফলে ফরাসীদের স্বদেশপ্রেম বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাশিয়ায় এইরূপ স্বদেশপ্রীতি জাগাইতে হইলে সেখানেও আমূল সংস্কার সাধন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশ হইতে ভূমিদাস প্রথা তুলিয়া দিলেন, সামন্ত প্রথার বিশেষ সুবিধাও উঠাইয়া দিলেন এবং সরকারী শিক্ষার উন্নতি সাধন করিলেন। এই সকল সংস্কারের ফলে প্রাশিয়ার জনগণের মধ্যে নূতন উদ্যম ও উৎসাহ দেখা দিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানীর অনেকেই প্রাশিয়ার উন্নতি দেখিয়া ভাবিলেন, একদিন হয়ত প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র জার্মানী একটি প্রকাণ্ড জাতীয় রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হইবে। ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের অভিযানের ইহা অভিনব ও অপ্রত্যাশিত ফল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব—সামন্ত প্রথার অবসান—প্রাশিয়ার উত্থান



১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্র প্রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি শুল্ক-প্রতিষ্ঠান গঠন করে, ইহার নাম জোলভেরাইন (Zollverein)। ইহার

কলকারখানাগুলি বৈদেশিক মূলধনে পরিচালিত হইত। শ্রমিকেরা অতি দীন-ভাবে জীবনযাপন করিত।

রুশ বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব

এতদ্ব্যতীত, রাশিয়ায় বহু সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়। টলস্টয়, তুর্গেনিভ্, ডস্টয়েভ্স্কি, পুস্কিন, গোগোল ও গোর্কী বিশ্ব-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই বুদ্ধিজীবী দল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার তীব্র সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠেন। এ-ছাড়া কার্ল মার্কসের দর্শন ও বিখ্যাত নৈরাজ্যবাদী লেখক বাকুনিনের চিন্তাধারা রুশদেশে ছড়াইয়া পড়িলে রাজনৈতিক প্রাচারকার্যের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে দেশে বহু রাজনৈতিক দলের উত্থান হয়। এই সকল দলের মধ্যে মার্কসপন্থী সমাজবাদী দল জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ লইয়া বিপ্লব গঠনে তৎপর হইল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রভাব

ইতিমধ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। বিদ্রোহ প্রশমিত করিতে জার ডুমা নামে এক পার্লামেন্ট স্থাপন করেন। কিন্তু এই পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য জারের অনুগামী হওয়ায় তাঁহার পক্ষে স্বৈরাচারী শাসন চালু রাখা সম্ভব হইল। এমতাবস্থায় পার্লামেন্টের বিরোধী সদস্যগণ সংগঠনে তৎপর হইল। তাহারা 'সোশিয়্যাল ডেমোক্র্যাটিক' দল নামে অভিহিত হইল, এই দলেরই একাংশ পরে 'বলশেভিক' নামে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়

এইরূপ পটভূমিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবের আগুনে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু অব্যবস্থা ও দুর্বলতার জন্য রুশসৈন্য রণক্ষেত্রে পরাস্ত হইতেছিল এবং সৈন্যগণকে অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই সময় খাদ্যাভাবের দরুন বড় বড় শহরে হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। সৈন্যগণও সরকারের বিরুদ্ধে গিয়া জনসাধারণের সহিত যোগ দিল।

এই সময় রাশিয়ার শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস দুর্বল ও অকর্মণ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নীর পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও নড়িতে পারিতেন

না ; আর জারিনার পরামর্শদাতা ছিলেন দুশ্চরিত্র সন্ন্যাসী রাসপুটিন। ফলে বিদ্রোহের পরিস্থিতি অনুযায়ী নীতি নির্ধারণের যোগ্যতার অভাবহেতু জার ব্যর্থ হইলেন। এমতাবস্থায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পেত্রোগার্ড শহরে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিলে জার নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করেন। রাশিয়ায় সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

অকর্মণ্য জার নিকোলাস—ব্যর্থতা ও সিংহাসন ত্যাগ

বিপ্লব সফল হইল। জারতন্ত্রের অবসান ঘটিল। শ্রমিক-কৃষক ও সেনাদলের জয় হইল। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠিত হইল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্থায়ী সরকার

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতা দখল করিলেও সেই সময় রাশিয়ায় 'সোভিয়েত'-গুলিই ছিল জনতার প্রকৃত প্রতিনিধি। এই সোভিয়েত-গুলি অবশ্য শ্রমিক ও সৈন্যদলের দখলে ছিল। স্বভাবতঃই প্রকৃত ক্ষমতা রহিল শ্রমিক ও সৈন্যদের হাতে। এদিকে অস্থায়ী সরকারের ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলির সহিত সহযোগিতার নীতি কেহই পছন্দ করিত না। শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্যের সূচনা হইল।

সোভিয়েত—প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী

এই সময় বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন বল্‌শেভিক দলের অবিসংবাদিত নেতা লেনিন (১৯১৭-১৯২৪ খ্রীঃ)। জারের আমলে বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য তিনি দেশ হইতে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু জারতন্ত্রের পতনের পর তিনি সুইজারল্যাণ্ড হইতে জার্মানীর সহায়তায় রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

লেনিনের অবদান



লেনিন

উদ্দেশ্য এই যে, বিদেশ হইতে যে-সকল পণ্য আসিবে তাহার উপর শুল্ক আদায় করা হইবে এবং বিভিন্ন জার্মান রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অনুপাতে সেই শুল্ক ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু জার্মান ইউনিয়নের ভিতরের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলিবে। এই বাণিজ্য সংস্থায় অস্ট্রিয়া ছাড়া বাকী জার্মান রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত হইল এবং প্রাশিয়া উহাদের নেতা হইল। এই অর্থনৈতিক ঐক্যই রাজনৈতিক ঐক্যের প্রথম সোপান।

জোলভেরাইন ও অর্থনৈতিক ঐক্য

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে আবার বিপ্লব দেখা দিল এবং ইহার ফলে তথাকার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিল। এই বিপ্লবের ঢেউ জার্মানীতেও আসিয়া পড়িল। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনের রাজপথে জনতার সহিত সৈন্যদের সাংঘাতিক সংঘর্ষ বাধিল। শেষ পর্যন্ত রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম জনগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নূতন সংবিধান রচনা করিলেন। এই সময় সমগ্র জার্মানীকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য ফ্রাঙ্কফুর্টে বিভিন্ন জার্মান রাষ্ট্রের জনগণের প্রতিনিধিদের এক সভা হইল ; এই সভা প্রাশিয়ার রাজাকে সম্মিলিত জার্মান সাম্রাজ্যের রাজমুকুট দান করিতে চাহিল। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা জনগণের প্রতিনিধিদের হাত হইতে রাজমুকুট লইতে রাজী হইলেন না। সুতরাং এই মহতী প্রচেষ্টা এইখানেই তখনকার মত থামিয়া গেল।

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের ফলাফল—ফ্রাঙ্কফুর্ট সভার ব্যর্থতা



বিস্‌মার্ক

ফ্রাঙ্কফুর্ট সভার ব্যর্থতার পর জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন বিস্‌মার্ক। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উইলিয়ম প্রাশিয়ার রাজা হন, এবং পরবৎসর তিনি বিস্‌মার্ককে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্‌মার্ক তাঁহার নীতি ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন, "এযুগে বড় বড় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইবে—বক্তৃতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রস্তাব দিয়া নহে,

রক্ত দিয়া আর অস্ত্র দিয়া।" গণতন্ত্রে ও প্রজাতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি রক্ত ও অস্ত্র দিয়া আধুনিক জার্মানীকে গড়িয়া তুলিলেন। বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র জার্মানীকে প্রাশিয়ার রাজার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমেই একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন এবং তারপর সেই সৈন্য দিয়া তিনটি ক্ষিপ্র যুদ্ধ দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিলেন।

বিস্‌মার্ক-এর নেতৃত্ব এবং তাঁহার নীতি

শ্লেজ্‌উইক ও হলস্টাইন নামে দুইটি ডাচি বা জমিদারী ডেনমার্কের রাজা বহুকাল হইতে ব্যক্তিগত স্বত্বে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। হলস্টাইন জার্মানীর মধ্যেই অবস্থিত এবং ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই জার্মান। শ্লেজ্‌উইকেও অনেক জার্মান বাস করিত; সুতরাং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই দুইটি অঞ্চল দখল করিবার জন্য বিস্‌মার্ক অস্ট্রিয়াকে হাত করিলেন। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া মিলিত-ভাবে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং অবিলম্বে ডাচি দুইটি অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল; প্রাশিয়ার ভাগে পড়িল শ্লেজ্‌উইক ও অস্ট্রিয়ার ভাগে পড়িল হলস্টাইন।

অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা—ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ

দুই বৎসর পরে হলস্টাইন লইয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। বিস্‌মার্ক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবামাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যেই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দিলেন। এই যুদ্ধ স্যাডোয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধের পর বিস্‌মার্ক অতি সহজ শর্তে সন্ধি করিয়া ফেলিলেন; সন্ধির ফলে জার্মানীর উপর অস্ট্রিয়ার আর কোন কর্তৃত্ব রহিল না। প্রাশিয়া উত্তর জার্মানীর কয়েকটি অঞ্চল দখল করিয়া লইল এবং বাকী অঞ্চলগুলি লইয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিল।

অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ

অস্ট্রিয়াকে জার্মানী হইতে বিতাড়িত করিয়াও বিস্‌মার্কের আশা পূর্ণ হইল না। দক্ষিণ জার্মানীর চারিটি রাষ্ট্র তখনও প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্বীকার করে নাই। এই চারিটি রাজ্য জোর করিয়া দখল করিতে গেলে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিত। এদিকে অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পূর্বে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ভাবিয়াছিলেন যে,

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ

অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া উভয় রাষ্ট্রই বহুদিন যুদ্ধ করিয়া দুর্বল হইয়া পড়িবে, তখন তিনি তাহাদের মধ্যে মধ্যস্থ করিতে আসিয়া কিছু লাভ করিবেন। কিন্তু অতি অপ্রত্যাশিতভাবে সাত সপ্তাহেই প্রাশিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া পরাক্রান্ত শক্তিতে পরিণত হইল। স্বভাবতঃই ফরাসী সম্রাট প্রমাদ গণিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে বিস্‌মার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের অজুহাত খুঁজিতেছিলেন। এই সময় স্পেনে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ফরাসী রাষ্ট্রদূত প্রাশিয়ার রাজার সহিত এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এক্ষণে বিস্‌মার্ক ঐ ঘটনাকে এমন আকারে প্রকাশ করিলেন যাহাতে ফরাসীরা মনে করে যে, তাহাদের রাষ্ট্রদূত অপমানিত হইয়াছেন; সুতরাং বিস্‌মার্কের কূট চক্রান্তে উত্তেজিত হইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রাশিয়া যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল; ফ্রান্স মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সৈন্য পরিচালনা করিয়া প্রাশিয়া সর্বত্র জয়লাভ করিল। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সেডানের যুদ্ধে (১৮৭০ খ্রীঃ) পরাস্ত হইয়া সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রাশিয়া জয়লাভ করিবার পর দক্ষিণের চারিটি জার্মান রাষ্ট্রও স্বেচ্ছায় প্রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হইল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদে ফরাসী সম্রাটদের প্রসিদ্ধ সভাগৃহে মহাসমারোহে মিলিত জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হইল। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ম সম্মিলিত জার্মানীর প্রথম কাইজার বা সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

যুদ্ধের অজুহাত

প্রাশিয়ার জয়লাভ ও ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

বিস্‌মার্কের রক্ত ও অস্ত্র-নীতি সফল হইল। এখন হইতে জার্মানী ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

(গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

সূচনা: ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্রীতদাস প্রথাকে কেন্দ্র করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে

-গতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপ হইতে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়। অতঃপর ইউরোপীয় শক্তিগুলি যখন সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল তখন আবার ক্রীতদাস প্রথা নূতন করিয়া চালু হইল।

গৃহযুদ্ধের কারণ—ক্রীতদাস প্রথা



ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার ('আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন' পুস্তকের পুরাতন সংস্করণ হইতে গৃহীত)

আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে খাদ্যশস্য ও তামাকের বড় বড় ক্ষেত ছিল এবং এই সকল ক্ষেতে কাজ করিবার জন্য প্রচুর লোকের প্রয়োজন হইত। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হইতে নিগ্রোদের ক্রীতদাসরূপে কিনিয়া আনিয়া এই সকল ক্ষেতে কাজ করান হইত। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া আমেরিকায় জাহাজ পৌঁছিতে অনেক সপ্তাহ, কখনও কখনও অনেক মাস কাটিয়া যাইত। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিগ্রো ক্রীতদাসেরা সংকীর্ণ গ্যালারির মধ্যে অতি কষ্টে ঠাসাঠাসিভাবে থাকিত। হ্যারিয়েট বীচার স্টো নামক

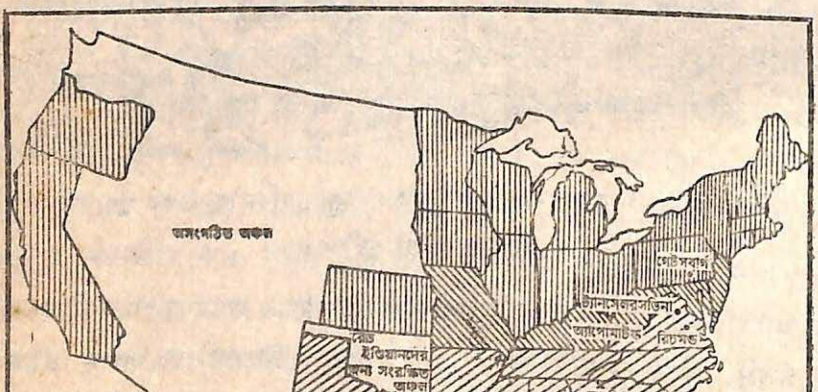
আমেরিকায় ক্রীতদাস নিয়োগের সূচনা

এক মার্কিন মহিলা 'আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন' নাম দিয়া একখানি বই লিখিয়াছিলেন। বইখানিতে সেকালের আমেরিকার দক্ষিণাংশে নিগ্রো ক্রীতদাসদের যে কঠোর জীবন যাপন করিতে হইত তাহার সম্বন্ধে অনেক করুণ কাহিনী লেখা আছে।

আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন

এদিকে ইতিমধ্যে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে দ্রুত শিল্পায়ন হইতেছিল। ইহার ফলে উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থের বৈষম্য দেখা দিল। উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিত বলিয়া তাহাদের ক্রীতদাসের দরকার হইত না। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির বড় বড় কৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তি ছিল ক্রীতদাস। সুতরাং ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ লইয়া দক্ষিণ ও উত্তরের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ শুরু হইল। এই সময় অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে বসতি বিস্তার ঘটিলে ঐ অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি আপন আপন শ্রমিক প্রথা কার্যকরী করিতে চাহিল। উত্তরাঞ্চল চাহিল স্বাধীন শ্রমিক, আর দক্ষিণাঞ্চল চাহিল

উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বার্থের বৈষম্য



ক্রীতদাস শ্রমিক। সুতরাং পশ্চিমের নূতন জমিতে বসবাস যতই বাড়িতে লাগিল ততই উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়িয়া চলিল।

ইতিমধ্যে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় 'প্রজাতান্ত্রিক দল' গঠিত হইয়াছিল। ক্রীতদাস প্রথার প্রসার রোধ করাই ছিল এই দলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, যদিও এই সময়ে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করিতেই ব্যস্ত ছিল। অতঃপর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দলে আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। লিঙ্কন ব্যক্তিগতভাবে ক্রীতদাস প্রথার অবসান চাহিলেও ঐ প্রথা উচ্ছেদের সমর্থক ছিলেন না* কিন্তু উচ্ছেদকামিগণ তাঁহাকে নিজেদের দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করিত। এমতাবস্থায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের ভয় হইল যে, এইবার ক্রীতদাসপ্রথার উচ্ছেদ হইবে। সুতরাং তাহারা যুক্তরাষ্ট্র হইতে চলিয়া আসিয়া নিজেদের একটি পৃথক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিতে তৎপর হইল। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষাকল্পে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সূচনা হইল।

প্রজাতান্ত্রিক দলের পত্তন—আব্রাহাম লিঙ্কন

গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা : আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি কাঠের গোলায় লিঙ্কনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন দরিদ্র ও নিরক্ষর। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ লিঙ্কনের হয় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু নিজের চেষ্টাতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি একজন বড় রাজনীতিক ও বড় বাগ্মী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্র এবং এক জটিল গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করিয়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে একদিকে ছিল মানবতার আদর্শ, অন্যদিকে বণিকের স্বার্থ। যুদ্ধচলাকালীন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্কন দাসমুক্তি ঘোষণা করিয়া মানবতার আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন।


আব্রাহাম লিঙ্কন

* World History : J. C. Revill, P. 652.

(ঘ) ইউরোপের শিল্পায়ন

সূচনা : শিল্প-বিপ্লব প্রথমে ইংলণ্ডে শুরু হইয়াছিল। ১৭৫০ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই এক শত বৎসরের মধ্যে নূতন যন্ত্রপাতি, বাষ্পীয় এঞ্জিন, বাষ্পীয় জাহাজ ও রেলগাড়ী আবিষ্কারের ফলে শিল্পজগতে সত্যই এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসিয়াছিল। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক হইতে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিল্পায়ন শুরু হইল। স্বভাবতঃই যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ও পুঁজির ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের আধিপত্যের অবসান ঘটিল। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী প্রভৃতি দেশে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। এ-ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিজ্ঞানকে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহার ফলে প্রযুক্তি-বিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এই সময়ে শিল্পোৎপাদনে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার এবং এঞ্জিনের জ্বালানী হিসাবে কয়লার পরিবর্তে খনিজ তৈলের ব্যবহার বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য। এই সময় আধুনিক ইস্পাত শিল্পের জন্ম হইয়াছিল এবং ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

ইংলণ্ডের প্রাধান্যের অবসান—প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি

ফলাফল : শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইতিপূর্বেই সমাজে ধনিক ও শ্রমিক এই দুই ভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। এক্ষণে ইউরোপের সর্বত্র শিল্পায়ন ঘটিলে এই শ্রেণীবৈষম্য আরও প্রকট হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধনিক শ্রেণীর প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কারণ সেই সময় বিভিন্ন দেশের শাসককুল ক্রমশঃ ধনী শিল্পপতিদিগের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বভাবতঃই এই অবস্থায় শ্রমিকদের জীবন কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। কাজের সময়ের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না, বেতনও যতদূর সম্ভব কম দেওয়া হইত। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিয়া কিছু ছিল না। এদিকে শিল্পের প্রসারের জন্য নিত্যনূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার ফলে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, ক্রমে শ্রমিককূল সুযোগ-সুবিধা

শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন

আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। এইরূপে শ্রমিককুল প্রথমে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠন আইনসিদ্ধ হইয়াছিল। ক্রমে ফ্রান্স ও জার্মানীতে ট্রেড ইউনিয়ন আইনসম্মত বলিয়া ঘোষিত হয়।

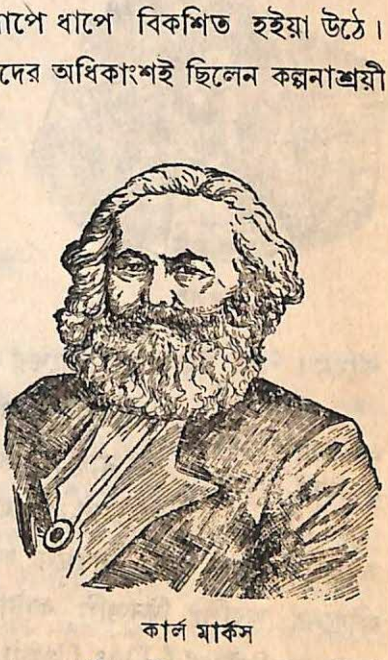
দেশের সরকারও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কারখানা আইন প্রবর্তন করিল। কিন্তু মূলধনী সম্প্রদায় ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের অবসান হইল না। কারণ মূলধনী সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ, শ্রমিকের আকাঙ্ক্ষা মালিকের স্বার্থের পরিপন্থী, স্বভাবতঃই এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া শোষণমুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের উত্থান

মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্ঃ সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্-এর নাম স্বভাবতঃই উল্লেখ্য। অবশ্য সমাজতন্ত্রের চেতনা মার্কসের আবির্ভাবের পূর্বেই ইউরোপে ধাপে ধাপে বিকশিত হইয়া উঠে। তবে মার্কসের মতে তাঁহার পূর্ববর্তী তাত্ত্বিকদের অধিকাংশই ছিলেন কল্পনাশ্রয়ী সমাজতান্ত্রিক।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রেনিশ প্রাশিয়ার অন্তর্গত ট্রায়ার নগরে কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ইহুদী, কিন্তু তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বন্ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আইন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সেই সময় জার্মানীতে গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবাত্মক আন্দোলন চলিতেছিল। মার্কস শীঘ্রই এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিলেন। অতঃপর ১৮৪২

কার্ল মার্কসের শিক্ষা ও প্রথম জীবন



কার্ল মার্কস

খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে সরকার-বিরোধী মতবাদ প্রচার করিবার অপরাধে জার্মানী হইতে বহিষ্কৃত হন।

এই সময় মার্কস প্যারিসে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদীদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। এইখানে সৌভাগ্যক্রমে ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌সের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এঙ্গেল্‌স্ মার্কস-এর সারা জীবন ধরিয়া বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। এঙ্গেল্‌স্-এর পিতা ছিলেন এক ধনী জার্মান, সূতাকলের মালিক। মান্‌চেস্টারে তাঁহার ব্যবসার একটি শাখা ছিল।

সহকর্মী এঙ্গেল্‌স্

এঙ্গেল্‌স্ ব্যবসা উপলক্ষে কিছুকাল মান্‌চেস্টারে বাস করেন এবং সেখানে তিনি ইংরেজ সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সহিত সুপরিচিত হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস প্যারিস হইতে বিতাড়িত হন এবং তাঁহার পত্নীও এঙ্গেল্‌স্-এর সহিত বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসেল্‌স্-এ বাস করিতে যান। ইতিমধ্যে বিপ্লবী সমাজবাদী বলিয়া মার্কস সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ও এঙ্গেল্‌স্ সমবেতভাবে কমিউনিস্ট ইস্তাহার (Communist manifesto) নামক এক বিখ্যাত প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারে জগতের শ্রমিকগণকে আহ্বান করিয়া বলা হইল, "সর্বহারাদের একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাইবার ভয় নাই। তাহারা সারা বিশ্ব জয় করিবে। সকল দেশের মজুরগণ, তোমরা সংঘবদ্ধ হও।" অতঃপর মার্কস লণ্ডনে আশ্রয় লইলেন এবং সেখানে অধ্যয়ন ও গবেষণায় রত থাকিয়া তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইলেন। এইস্থানে তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ডাস ক্যাপিটাল' (Das Capital) নামে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।



এঙ্গেল্‌স্

কমিউনিস্ট ইস্তাহার

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি রক্ষণশীল দেশের প্রতিনিধিগণ দ্বারা প্রাক্-বিপ্লব পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস। বিপ্লবপ্রসূত চিন্তাধারা তথা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ পরিত্যাগ। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস কার্যত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সাফল্যের ইতিহাস।

২. ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইতালি—ভিয়েনা বৈঠকের পরবর্তী পর্যায়ের মুক্তি আন্দোলন। মাৎসিনি, কাভুর এবং গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে ইতালির ঐক্য আন্দোলনে সফলতা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের প্ররোক্ষ ফল : ইতালির ঐক্য পূর্ণতাপ্রাপ্তি।

৩. ফরাসী বিপ্লবোত্তর জার্মানী : নেপোলিয়ন কর্তৃক রাইনের রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে জার্মানীতে আন্দোলন ও উহার ব্যর্থতা—বিসমার্কের উত্থান, 'রক্ত ও অস্ত্রের' নীতি। পরপর তিনটি যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে জার্মানীর ঐক্যসাধন—জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (১৮৭১ খ্রীঃ)।

৪. আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ : ক্রীতদাস-প্রথা, উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ, আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা। আমেরিকার অখণ্ডতা রক্ষা।

৫. অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক হইতে পশ্চিম ইউরোপে শিল্পায়ন—প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অগ্রগতি—বিদ্যুতের ও জ্বালানি তেলের প্রচলন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার। সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ : কার্ল মার্কস্ ও এঙ্গেল্স-এর সাম্যবাদী চিন্তাধারা।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। কিভাবে মেটারনিকের নেতৃত্বে ন্যায্য-অধিকার নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইয়াছিল? ২। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিভাবে ইতালীয় ঐক্যের প্রস্তুতি রচিত হইয়াছিল? ৩। ইতালির ঐক্য আন্দোলনে ম্যাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর অবদান সহ ঐ আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৪। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের প্রভাব পর্যন্ত জার্মানীর উদারনৈতিক আন্দোলন ও ঐক্যের প্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা কর। ৫। বিসমার্কের নেতৃত্বে কিভাবে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল? ৬। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৭। ইউরোপের শিল্পায়ন ও উহার ফলাফল সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৮। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্ল মার্কস্ ও এঙ্গেলসের অবদান কি ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) মেটারনিক কে ছিলেন এবং তিনি কিভাবে ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরিচালিত করিয়াছিলেন ? (২) ম্যাৎসিনি কিভাবে ইতালির ঐক্যের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ? (৩) আব্রাহাম লিঙ্কন কে ছিলেন এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধে তাঁহার কি ভূমিকা ছিল ? (৪) কিভাবে ইউরোপে শিল্পায়ন শুরু হইয়াছিল ?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও : (ক) কে ভিয়েনা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ? (খ) কাভুর কোন্ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ? (গ) ফ্রাঙ্কফুর্টের সভায় কাহাকে সম্মিলিত জার্মান সাম্রাজ্যের রাজমুকুট দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল ? (ঘ) কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস যৌথভাবে কোন্ ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) নেপোলিয়নের পতনের পর — রাজধানী ভিয়েনাতে বৈঠক হয়। (২) — ভিয়েনা বৈঠকে সভাপতি ছিলেন। (৩) ইতালির জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ছিলেন —। (৪) সার্ডিনিয়া রাজ্যের রাজা ছিলেন —। (৫) কাভুর প্রথমে — যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়াছিলেন। (৬) প্রাসিয়ার নেতৃত্বে — নামে একটি শুল্ক সংঘ স্থাপিত হয়। (৭) — গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। (৮) ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে — যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়। (৯) 'আঙ্কল টম্স্ কেবিনে'র লেখিকা ছিলেন —। (১০) আমেরিকার — দল ক্রীতদাস প্রথার প্রসার রোধ করিতে চাহিয়াছিল। (১১) — খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠন আইনসিদ্ধ হয়। (১২) মার্কস ও — যৌথভাবে — নামে এক বিখ্যাত প্রচারপত্র প্রকাশ করেন।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) ভিয়েনা বৈঠকে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র প্রাধান্য পাইয়াছিল ? (২) কোন্ চুক্তির ভিত্তি অনুযায়ী ইউরোপীয় শক্তিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ? (৩) ইতালির ঐক্যের পূর্বে কে সমগ্র ইতালি জয় করিয়া এক শাসনে আনিয়াছিলেন ? (৪) কাভুর কে ছিলেন ? (৫) রাজা দ্বিতীয় ভিকটর ইমানুয়েল কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন ? (৬) গ্যারিবল্ডী কতজন সৈন্য লইয়া কোন্ দ্বীপ দখল করিয়াছিলেন ? (৭) বিসমার্ক কোন্ কোন্ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন ? (৮) কোন্ সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপ হইতে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয় ? (৯) কোন্ বৎসর দাসমুক্তি ঘোষিত হয় ? (১০) সাম্যবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কে ছিলেন ? (১১) 'ডাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

দশম অধ্যায়

(ক) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনাপ্রবাহ

সূচনা : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে বৃটিশ অধিকার স্থাপিত হয়। ইংরাজ বণিকেরা ভারত হইতে চীনে প্রচুর আফিং চালান দিত। চীন তখন মাঞ্চু সম্রাটদের শাসনে ছিল। আফিং অনিষ্টকর নেশা বলিয়া চীন সরকার আইন জারি করিলেন যে, চীনদেশে আফিং আমদানি করা চলিবে না। কিন্তু ইংরাজদের কাছে ইহা ছিল অত্যন্ত লাভের ব্যবসা আর মাঞ্চু সরকার ছিল আমলাতান্ত্রিক ও দুর্নীতিপরায়ণ। ফলে আফিং-এর চোরাই চালান আরম্ভ হইল। এমতাবস্থায় মাঞ্চু সরকারের আদেশে ইংরাজ বণিকদের সমস্ত আফিং বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইহাতে ইংরাজ বণিকদের স্বার্থে খুব আঘাত লাগিল। তাহাদের কথায় ইংরাজ সরকার ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্যায়ভাবে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ প্রথম অহিফেন যুদ্ধ নামে পরিচিত। বৃটিশ রণতরী ক্যাণ্টন ও আরও অনেক বন্দর অবরোধ করিল। দুই বৎসর লড়াই করিয়া চীনারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইংরাজ সেনাদলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি করিল। সেইমত ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নানকিং-এর সন্ধি হইল। চীনকে যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ বহু অর্থ দিতে হইল এবং পাঁচটি বন্দরে বিদেশীদের বাণিজ্যের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

অহিফেন যুদ্ধের কারণ

নানকিং-এর সন্ধি

নানকিং-এর সন্ধির অব্যবহিত পরে (১৮৪৩ খ্রীঃ) বৃটেন চীনের সহিত একটি পৃথক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে। ইহা দ্বারা চীনে বৃটেনের 'অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' স্বীকৃত হয় এবং বন্দর বেষ্টিত চীনের অভ্যন্তরে বৃটিশ নাগরিকদের চলাফেরার অধিকার চীন সরকার মানিয়া লইয়াছিল।

চীন কিন্তু তখনও বিদেশীদের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিত। সন্ধিভুক্ত পাঁচটি বন্দর ছাড়া বিদেশীদিগকে আর কোথাও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। সুতরাং চীনের অভ্যন্তরভাগ উন্মুক্ত করিবার জন্য

আর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বৃটিশ পতাকার অবমাননা করা হইয়াছে এবং একজন ফরাসী মিশনারীকে হত্যা করা হইয়াছে এই অজুহাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একযোগে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহা দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ (১৮৫৭ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মাঞ্চু সরকার টিয়েনসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়। মাঞ্চু সরকার এই সন্ধি কার্যকর করিতে ইতস্ততঃ করায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং-এর কনভেশন অনুযায়ী বিদেশীরা আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইল। আরও ১১টি বন্দর বিদেশীদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। ঐ সকল বন্দরে পাশ্চাত্য দেশগুলি 'অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' লাভ করে। নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হইল। আফিং-এর ব্যবসা চালাইবার অনুমতি এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ—
টিয়েনসিনের সন্ধি

ইতিমধ্যে জাপান আধুনিক পদ্ধতিতে নৌবহর ও সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করিয়াছিল, সুতরাং ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে চীনকে সহজে হারাইয়া দিয়া ফরমোসা দ্বীপ দখল করিল। মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণভাগও জাপান দখল করিল।

কিন্তু এই সময় ফ্রান্স ও জার্মানীর সাহায্য লইয়া রাশিয়া জাপানকে বাধা দিয়াছিল। এমন কি, চীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার অজুহাতে তাহারা জাপানকে লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার চীনকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল পরেই পাশ্চাত্য শক্তিগুলি নিজেরাই চীনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নূতন অধিকার আদায় করিতে (১৮৯৭-৯৮ খ্রীঃ) ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই পর্যায়ে প্রথমে উদ্যোগী হইয়াছিল ফ্রান্স। ফরাসী-অধিকৃত চীন হইতে দক্ষিণ চীন পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ, ইউনান, কোয়াং সি এবং কোয়াং তুং অঞ্চলের খনিজ সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ এবং চীনের কতকগুলি এলাকাকে বিশেষ প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করা প্রভৃতি ছিল ফরাসীদের প্রধান প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা সহজেই সফল হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য দেশসমূহ কর্তৃক চীন বিভাজন—ফ্রান্স

এদিকে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াকে রুশ প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করে এবং

পোর্ট আর্থার বন্দোবস্ত লইতে সমর্থ হয়। রাশিয়া পোর্ট আর্থার এলাকায় রেলপথ নির্মাণের সুযোগও লাভ করিয়াছিল। অপর এক

রাশিয়া ও জার্মান

সন্ধি দ্বারা জার্মানী কিয়াওচৌ উপসাগরের চতুর্দিকস্থ এলাকার ইজারা লাভ করে। এ-ছাড়া সমগ্র সাণ্টুং প্রদেশে খনিজ সম্পদের ব্যবহার, রেলপথ নির্মাণ, শিল্পায়ন ও বাণিজ্য বিস্তার প্রভৃতি জার্মানীর অধিকারভুক্ত হয়।

ইংলণ্ড প্রথমে চুপচাপ ছিল। কিন্তু রাশিয়া পোর্ট আর্থারের বন্দোবস্ত লইতেছে দেখিয়া ইংলণ্ডও ওয়ে-হায়-ওয়ের নৌ-ঘাঁটির ইজারা আদায় করিল। স্থির হইল রাশিয়া যতদিন পোর্ট আর্থার দখল

ইংলণ্ড ও ইতালি

করিয়া থাকিবে ততদিন ইংলণ্ড এই নৌ-ঘাঁটি দখল করিবে। এ-ছাড়া সমগ্র ইয়াংসি উপত্যকায় ইংলণ্ডের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ঐ অঞ্চলে ইংলণ্ড রেলপথ নির্মাণের সুযোগ আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। এ-ছাড়া এই ভাগাভাগির সময় ইতালি চীনের কিছু অংশের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ইতালি তখন খুবই দুর্বল। ফলে চীন ইতালির দাবিসমূহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

চীন সাম্রাজ্য বিভাজনের এই উদ্যোগকে তরমুজ বিভাজনের সহিত তুলনা করা চলে। একটি তরমুজকে যেমন খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয় পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ সেইরূপ চীনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া চীন সাম্রাজ্য খণ্ডীকরণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এদিকে নজর পড়িল। আমেরিকার তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন হো ঘোষণা করিলেন যে, চীনে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার ও টাকা খাটাইবার ব্যাপারে সমস্ত জাতিকে ঠিক সমান

চীনে মুক্তদ্বার

সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। ইহাকে বলা হয় চীনে 'মুক্তদ্বার নীতি' (১৯০১ খ্রীঃ)। অন্যান্য জাতিরাও ইহাতে রাজী হইল। সুতরাং চীনকে আর ভাঙ্গিয়া ভাগাভাগি করা চলিল না।

চীনের প্রতিক্রিয়া ঃ অহিফেন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বোঝা চীনের অর্থনীতিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। কৃষককুলের দুর্দশার কোন অন্ত ছিল না। এই সঙ্গে ছিল সাধারণ লোকের দুর্নীতিগ্রস্ত মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে

দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। এই পটভূমিতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে তাইপিং বিদ্রোহের সূচনা হয়। প্রথমে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন রূপে শুরু হইলেও ক্রমশঃ এই বিদ্রোহ রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপ ধারণ করে। চীনের নয়টি প্রদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীরা নানকিং অধিকার করিয়া সেখানে তাহাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে। অবশেষে বিদেশীদের হস্তক্ষেপের ফলে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ব্যর্থ হইলেও এই বিদ্রোহই ছিল চীনের প্রথম বিপ্লবী যুদ্ধ।

তাইপিং বিদ্রোহ

তাইপিং বিদ্রোহের ত্রিশ বৎসর পর চীন যখন বিদেশীদের হাতে খণ্ডীকরণের সম্মুখীন, সেই সময় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে গৌরবময় শতদিনের সংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চীনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিলে চীনের সম্রাট কোয়াং সু স্বয়ং সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সেইমত একের পর এক সংস্কার ডিক্রী প্রচারিত হয়, শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার হইল, অনুবাদ বিভাগ চালু হইল, সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত হইল। কিন্তু ইহাতে রক্ষণশীল দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে এবং তাহারা প্রাক্তন সম্রাটের বিধবা ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞীর সহায়তায় এই সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ফলে সম্রাট ধৃত ও বন্দী হন এবং সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শতদিনের সংস্কার —১৮৯৮ খ্রীঃ

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতার পর চীনে পুরাতন তন্ত্র পুনরায় ফিরিয়া আসে। ক্রমে রক্ষণশীল দেশপ্রেমিকেরা একটি আত্মরক্ষী সেনাদল গড়িয়া তুলিল, ইহার নাম হইল ঐক্যের মুষ্টি; বিদেশীরা ইহার নাম দিল 'বক্সার' বা মুষ্টিযোদ্ধা। প্রথমে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মাঞ্চুদের উচ্ছেদ করা এবং বিদেশীদের হস্তক্ষেপ হইতে চীনকে মুক্ত করা। পরে মাঞ্চু সম্রাজ্ঞী এই আন্দোলনকে সমর্থন করায় বক্সারগণ কেবলমাত্র বৈদেশিকগণের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। ফলে শীঘ্রই বক্সারদের সহিত পাশ্চাত্য জাতিদের সংঘর্ষ বাধিল। বহু মিশনারী ও চীনা খ্রীষ্টান নিহত হইল। পিকিং-এ

বক্সার বিদ্রোহ —১৮৯৯ খ্রীঃ

বিদেশী দূতাবাস অবরুদ্ধ হইল। শেষে আটটি দেশের সম্মিলিত বাহিনীর হাতে বক্সার বাহিনী পরাজিত হইল। রাজপ্রাসাদ অধিকার করা হইল এবং পিকিং শহর লুঠ করা হইল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং সন্ধি দ্বারা বিদেশীদিগকে আরও অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রচুর টাকা দিতে চীনকে বাধ্য করা হইল।

পিকিং সন্ধি

চীনের এই দুর্দিনে স্বভাবতঃই মাঞ্চু শাসন বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞী জু-সি রক্ষণশীল সংস্কারের উদ্বোধন করেন। আধুনিক শিক্ষা, শাসনতন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, রেলপথ নির্মাণ, খনি খনন, অস্ত্রাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে চৈনিক পুঁজিকে উৎসাহ দান প্রভৃতি এই সংস্কার প্রচেষ্টার অঙ্গ ছিল। অতঃপর ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের সাফল্য দেখিয়া চীনে আবার সংস্কারের কথা উঠিল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিবার জন্য হাজার হাজার ছাত্রকে জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠান হইল। রেলপথ নির্মিত হইল, আধুনিক রীতিতে নৌবহর ও সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলা হইল। সরকারী কর্মপ্রার্থীদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আইন, শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইল। এ-ছাড়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থির হইল যে, নয় বৎসরের মধ্যে জাতীয় পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসিবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে ধাপে ধাপে সংস্কারের কাজ চলিবে।

ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞীর প্রতিক্রিয়া

অভ্যন্তরীণ সংস্কারের নব-প্রচেষ্টা

চীনের দেশপ্রেমিকের মধ্যে অনেকেই কিন্তু সংস্কার প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত করিয়া আরও বেশি আগাইয়া যাইতে চাহিল। তাহারা মাঞ্চু সরকারের দুর্বলতা এবং বিশেষতঃ বিদেশীদের সুযোগ-সুবিধা দিবার নীতি পছন্দ করিত না। এদিকে ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের ফলে গণ-অসন্তোষ তীব্র হইলে দেশপ্রেমিকগণ সংঘবদ্ধ-ভাবে আন্দোলন শুরু করিল। ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে এক বিপ্লব হইল। পর বৎসর মাঞ্চু সম্রাট পদত্যাগ করেন।

শেষ মাঞ্চু সম্রাটের পদচ্যুতি

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের নেতা ছিলেন সান্-ইয়াৎ সেন (১৮৬৬-১৯২৫ খ্রীঃ)।

তিনি ছিলেন একজন সম্পন্ন কৃষকের সন্তান এবং পেশায় ডাক্তার। কিন্তু চীনের দুর্দশা দেখিয়া তিনি চিকিৎসকের খ্যাতি বিসর্জন দিয়া রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়েন। বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাপানে নির্বাসিত চীনাদের লইয়া একটি বিপ্লবী সমিতি গঠন করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব তাঁহার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী চীনে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। অতঃপর সান্-ইয়াৎ সেন স্বেচ্ছায় নূতন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইউ-য়ান-সিকাই-কে রাষ্ট্রপতি করিয়াছিলেন।

প্রজাতান্ত্রিক চীন —সান্-ইয়াৎ সেন



সান্-ইয়াৎ সেন

ইউ-য়ান ছিলেন মাঞ্চু সরকারের প্রাক্তন সেনাপতি। তিনি ছিলেন অতীব উচ্চাভিলাষী এবং সামন্ত ও সামরিক প্রভুদের প্রতিনিধি। এই সকল কারণে অচিরেই তিনি প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা তথা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে সচেষ্ট হইলেন। এমতাবস্থায় প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য সান্-ইয়াৎ সেন কুয়োমিন্ তাঙ্ বা জাতীয় দল গঠন করেন। এই জাতীয় দলের সহিত শীঘ্রই ইউ-য়ান-সিকাই-এর সরকারের বিরোধ বাধিল। সান তখন দক্ষিণ-চীনে একটি নূতন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

ইউ-য়ান-সিকাই ও সান্-ইয়াৎ সেন

(খ) জাপানের অভ্যুদয়

সূচনা ঃ মধ্যযুগের ইউরোপের ন্যায় জাপানে সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। বড় বড় সামন্তরা ছিলেন দেশের মালিক। এ-ছাড়া জাপানে একটি যোদ্ধৃশ্রেণী ছিল। ইহাদের নাম ছিল সামুরাই। জাপানের সম্রাটকে বিদেশীরা নাম দিয়াছিল মিকাডো। মিকাডোর ক্ষমতা প্রায় কিছুই ছিল

না। সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির নাম ছিল সোগুন। সোগুন ছিলেন সামন্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রাজ্যের সর্বেসর্বা, কিন্তু তিনি বাহিরে সম্রাটকে সর্ববিধ সম্মান দেখাইয়া চলিতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিদেশী শক্তিসমূহ জাপানে প্রবেশ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। এ-বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী হইল।

জাপানে বিদেশীদের প্রবেশাধিকার লইয়া যুদ্ধ ও চুক্তি

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন নৌ-সেনাপতি পেরী চারখানি যুদ্ধ-জাহাজ সহ জাপানের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি স্থাপনের দাবি জানাইয়া গেলেন। পরবৎসর দশখানি যুদ্ধ জাহাজ ও কামান লইয়া আবার তিনি উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ভীত হইয়া জাপান আমেরিকার সহিত বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনে (১৮৫৪ খ্রীঃ) রাজী হইলে জাপান পাশ্চাত্য প্রভাবের নিকট উন্মুক্ত হইল। অতঃপর অপরাপর পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আমেরিকার দেখাদেখি অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইল। এমতাবস্থায় জাপান উপলব্ধি করিল যে, একমাত্র পাশ্চাত্য প্রথা অনুকরণের মাধ্যমেই পাশ্চাত্য আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব।

এদিকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এক অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়। সকলের অনুরোধে সোগুন পদত্যাগ করিলেন। সোগুনের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। সামন্ততন্ত্রের অবসান হইল। মিকাডো বা সম্রাট মুৎসোহিতো সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে পাইলেন। জাপানের ইতিহাসে ইহাই সম্রাটের 'ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা' নামে অভিহিত। মুৎসোহিতো ১৮৬৭ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার আমলে জাপান সবদিকে দ্রুত উন্নতি করিল। ওই কারণে ঐ সময়কালকে 'মেইজি এরা' বা সংস্কারের যুগ বলা হয়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বিপ্লব


মুৎসোহিতো

সংস্কারের যুগে দেশে সামন্ত প্রথা উঠিয়া গেল। সামন্তদের পরিবর্তে

সম্রাটের কর্মচারীরা দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের অনুকরণে জাপানের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। সেই মত সম্রাটকে পরামর্শদান ও সাহায্যের জন্য দ্বি-কক্ষ-সংবলিত বিধানসভা স্থাপিত হইল। এই সঙ্গে জাপানীরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিজেদের আইন-কানুনের সংস্কার করিল।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে সংস্কার: (১) রাজনৈতিক

(২) অর্থনৈতিক

শিল্পে জাপান পাশ্চাত্য দেশকে ছাড়াইয়া গেল। ইউরোপীয়দের মত তাহারা রেলপথ, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা প্রভৃতি স্থাপন করিল এবং বড় বড় জাহাজ ও স্টীমার নির্মাণ করিল। জাপানের লোকসংখ্যা প্রচুর এবং স্বল্প মজুরীতে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যাইত। সুতরাং পাশ্চাত্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে জাপান অতি সস্তায় শিল্পদ্রব্য তৈয়ারি করিতে লাগিল। ফলে অতি অল্প সময়ে তাহারা শ্রমশিল্পে ও বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি করিল।

(৩) সামাজিক

পূর্বে জাপানীদের বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সহিত মেলামেশাতেও বাধা দেওয়া হইত। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল বাধা-নিষেধ উঠিয়া গেল। জাপানী ছাত্ররা পাশ্চাত্য শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের জাপানের অভ্যন্তরে নিযুক্ত করা হইল।

(৪) সামরিক

সামরিক বিভাগেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হইল। পেশাদার সামুরাই-এর বদলে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠিত হইল। সকলের পক্ষে সামরিক শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যিক করা হইল। পাশ্চাত্য প্রণালীতে সামরিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ও জার্মানীর সেনাপতিদিগের সাহায্য লওয়া হইল। নৌ-বিভাগের প্রশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন একজন ইংরাজ সেনাপতি।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জাপান অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রমাণ মিলিল ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে। জাপানের পশ্চিমদিকে অবস্থিত কোরিয়া উপদ্বীপটিকে উপলক্ষ করিয়া এই যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন কোরিয়াতে কোন শক্তিশালী বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে

জাপানের বিপদের সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে ইহা বলা হইত যে, "কোরিয়া জাপানের হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে উদ্যত একটি ছুরিকার মত।" ইতিমধ্যে কোরিয়ার প্রদেশগুলিতে নানাধরনের অশান্তি বিরাজ করিতেছিল এবং সেই কারণে সেখানে বৈদেশিক শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাও সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় রাশিয়া কোরিয়ার সামরিক বাহিনী পুনর্গঠনে তৎপর হইয়াছিল। এ-ছাড়া জাপানের শিল্পোৎপাদনের প্রাচুর্যতা হেতু কোরিয়াতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কোরিয়ার কাঁচামাল দখল এবং সেখানে জাপানী শিল্পদ্রব্যের বাজার প্রতিষ্ঠা জাপানী শিল্পপতিদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিলে উহা দমনের উদ্দেশ্যে চীন এক সেনাদল প্রেরণ করিলে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধে জাপান চীনকে অনায়াসে হারাইয়া দিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শিমনোসেকির সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হইল। কোরিয়ার স্বাধীনতা চীন স্বীকার করিয়া লইল। কোরিয়ার সংলগ্ন মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণাংশ, ফরমোজা ও পেস্কাডোরেজ দ্বীপপুঞ্জ চীন জাপানকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু শীঘ্রই রাশিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্স শিমনোসেকির চুক্তির বিরোধিতা করিল। ইহার ফলে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার চীনকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

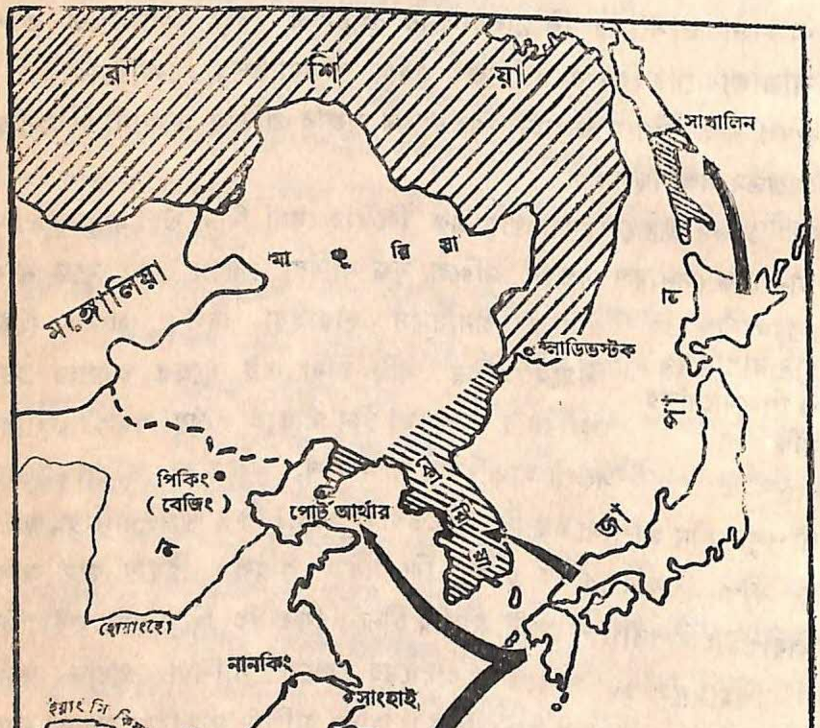
চীন-জাপান যুদ্ধ ও শিমনোসেকির সন্ধি

শিমনোসেকির সন্ধিতে বাধাদানের ক্ষেত্রে রাশিয়া প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে তাহার ক্ষমতা বিস্তারে আগ্রহী ছিল। সুতরাং রাশিয়াকে বাধাদানের জন্য জাপান প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হইল। স্থির হইল ইংলণ্ড বা জাপান চীন ও কোরিয়ায় আপন আপন স্বার্থ রক্ষার্থে একাধিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হইলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে। রুশ-জাপান সম্ভাব্য যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সন্ধির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ইংলণ্ড ও জাপানের মৈত্রী স্থাপন—১৯০২ খ্রীঃ

জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধি

এই সন্ধির ফলে স্বভাবতঃই জাপানের শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই প্রথম পাশ্চাত্য দেশের এক বৃহৎ শক্তির সহিত এশীয় রাষ্ট্র জাপানের সমতার ভিত্তিতে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ফলে জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। অধিকন্তু এই সন্ধি ছিল প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানী শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়।



রাশিয়া স্বভাবতঃই সুদূর প্রাচ্যে জাপানকে নূতন ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ভাবিত। রাশিয়া ইতিমধ্যে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ নির্মাণে

উদ্যোগী হইয়াছিল এবং ঐ রেলপথ নির্মাণ করিয়া রাশিয়ার ট্রান্স সাইবেরিয়া রেলপথের সহিত উহার যোগাযোগ সম্পন্ন করে। ইহার ফলে রাশিয়া হইতে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে সরাসরি সৈন্য প্রেরণ সহজ হইয়াছিল। অতঃপর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে চীনে 'বক্সার বিদ্রোহ' দেখা দিলে ঐ বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে রাশিয়া একদল সৈন্য লইয়া মাঞ্চুরিয়ায় ঢুকিয়া পড়ে। ক্রমে রাশিয়া কার্যতঃ মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া লইলে জাপান উহার প্রতিবাদে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৯০৪ খ্রীঃ)।

রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ

জাপান স্থল ও জলযুদ্ধে রাশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পোর্টসমাউথ সন্ধি দ্বারা রাশিয়া পোর্ট আর্থার বন্দর ও শাখালীন দ্বীপের অর্ধেক ছাড়িয়া দিল। সমগ্র কোরিয়ায় এবং মাঞ্চুরীয়ার দক্ষিণাংশে জাপানের আধিপত্য স্বীকৃত হইল, মাঞ্চুরীয় রেলপথ ও খনির অধিকার জাপানের হাতে আসিল। এই যুদ্ধের আর একটি চমৎকার ফল হইল। ক্ষুদ্র জাপানের নিকট সুবৃহৎ রাশিয়ার পরাজয়ে প্রমাণ হইল যে, এশীয় জাতিরা ইউরোপীয় জাতিদেরও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে। ইহাতে সমগ্র এশিয়ার আত্মসম্মান বাড়িয়া গেল। এশিয়াতে 'জাতীয়তাবাদ' আরও দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িল। 'এশিয়ায় এশিয়ার অধিকার' এই ধ্বনিরও সৃষ্টি হইল।

কোরিয়া দখল

জাপান ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল, যুক্তরাষ্ট্রও তাহাকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, কোরিয়ায় সে যাহা খুশী করিতে পারে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত ফিলিপাইনের উপর যেন সে নজর না দেয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে কোন বাধা না থাকায় জাপান দুর্বল চীনের সহিত যদৃচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া জয় করিল এবং চার বৎসর পরে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'একুশ দফা' দাবি উত্থাপন করিয়া চীনের নিকট হইতে সাণ্টুং, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি অঞ্চল দখল ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে তৎপর হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং চীনের উপর ২১ দফা দাবি

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীনে মাঞ্চু রাজবংশের শাসনকালে ইংরাজ বণিকদের স্বার্থ-রক্ষার্থে অহিফেন যুদ্ধ—চীনাদের পরাজয় এবং নানকিং-এর সন্ধি।

২. বৃটেনের 'অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' বৃদ্ধি—চীনের অভ্যন্তর উন্মুক্ত করিবার প্রচেষ্টা দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ—পাশ্চাত্য দেশসমূহ কর্তৃক চীন বিভাজন—চীনে 'মুক্তদ্বার নীতি'।

৩. মাঞ্চু রাজগণের অপ-শাসনের বিরুদ্ধে চীনে বিদ্রোহ—বিদ্রোহে কৃষকদের অংশগ্রহণ—গৌরবময় শতদিনের সংস্কার আন্দোলন। সংস্কারের সূচনা : রক্ষণশীল দলের ষড়যন্ত্র এবং সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা, বক্সার বিদ্রোহ।

৪. ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ডাওয়েজার সাম্রাজ্ঞী কর্তৃক রক্ষণশীল সংস্কারের উদ্বোধন। নানাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন। চানের দেশপ্রেমিকদের মধ্যে সংস্কার আরও ত্বরান্বিত করিবার চেষ্টা, মাঞ্চু সম্রাটের পদত্যাগ (১৯১২ খ্রীঃ)।

৫. সান্-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্ব—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা।

৬. জাপান : ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত জাপানের বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন এবং জাপানে পাশ্চাত্য প্রভাবের সূচনা।

৭. ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্বিপ্লব—সম্রাটের ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 'মেইজি এরা' বা সংস্কারের যুগের সূচনা, পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কার। জাপানের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি—চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়—ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি (১৯০২ খ্রীঃ)—রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের সাফল্য 'সমগ্র এশিয়ার আত্মসম্মান বৃদ্ধি'। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। অহিফেন যুদ্ধ ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ২। পাশ্চাত্য দেশসমূহ কর্তৃক চীন বিভাজন ও উহার ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৩। জাপানে সংস্কারের যুগে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সংস্কার হইয়াছিল? ৪। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ৫। কি কারণে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল? ঐ যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) তাইপিং বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান? (২) কখন এবং কিভাবে চীনে শতদিনের সংস্কার শুরু হইয়াছিল? (৩) বক্সার বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান?

(৪) ইউয়ান সিকাই কে ছিলেন ? (৫) ইঙ্গ-জাপান চুক্তির গুরুত্ব কি ছিল ?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও : (ক) চীনের খণ্ডীকরণ প্রতিরোধকল্পে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে কোন্ নীতি গৃহীত হইয়াছিল ? (খ) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে কে চীনের নেতা ছিলেন ? (গ) কোন্ সন্ধি দ্বারা চীন-জাপান যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল ? (ঘ) কখন জাপান চীনের বিরুদ্ধে ২১ দফা দাবি উত্থাপন করিয়াছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) প্রথম অহিফেন যুদ্ধে চীনের পরাজয় হইলে — এর সন্ধি হয়। (২) আমেরিকার — ঘোষণা অনুযায়ী চীনে 'মুক্তদ্বার নীতি' চালু হয়। (৩) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে—বিদ্রোহের সূচনা হয়। (৪) সান-ইয়াৎ সেন স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করিয়া — কে রাষ্ট্রপতি করিয়াছিলেন। (৫) প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য সান ইয়াৎ-সেন — দল গঠন করেন। (৬) ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বিপ্লবকালে জাপানের সম্রাট ছিলেন—। (৭) — খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধ হয়। (৮) ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে — সন্ধি দ্বারা চীন-জাপান যুদ্ধ শেষ হয়। (৯) — সন্ধির ফলে সমগ্র কোরিয়ার উপর জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) চীনে আফিং-এর চোরাচালান বন্ধ হইলে কাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল ? (২) কাহার অবমাননাকে কেন্দ্র করিয়া দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ হয় ? (৩) চীন সাম্রাজ্যের বিভাজনকে কিসের সহিত তুলনা করা হয় ? (৪) গৌরবময় শতদিনের সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? (৫) কাহারা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে বক্সার নাম দিয়াছিল ? (৬) জাপানের যোদ্ধৃ শ্রেণীর কি নাম ছিল ? (৭) কাহার সহিত বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের ফলে জাপান পাশ্চাত্য দেশের নিকট উন্মুক্ত হইল ? (৮) মেইজি সংস্কারের যুগে কোন্ প্রথা উঠিয়া গেল ? (৯) কোন্ উপদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া চীন-জাপান যুদ্ধ হইয়াছিল ? (১০) রুশ-জাপান যুদ্ধের পূর্বে জাপান কোন দেশের সহিত সন্ধি করিয়াছিল ?

একাদশ অধ্যায়

বৃটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ

সূচনা ঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব আর রহিল না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট বৃটিশ পার্লামেণ্টে একটি নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। সেই অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজশক্তি প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত সংস্থা 'বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল'-এর অবসান হইল এবং এক্ষণে ভারত শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত দায়-দায়িত্ব বৃটিশ মন্ত্রিসভায় নব-নিযুক্ত একজন মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইল। এই মন্ত্রীর উপাধি হইল ভারত-সচিব। এই সঙ্গে ভারতের গভর্নর-জেনারেল বা বড়লাট এখন হইতে ভাইস্‌রয় বা রাজ-প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইলেন।

নূতন শাসন-ব্যবস্থা

সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর বৃটিশ শক্তি ভারতের অভ্যন্তরে কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয় নাই। তবে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন লরেন্সের শাসনকালে ভুটান যুদ্ধ, লর্ড লিটনের রাজত্বকালে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-৮১ খ্রীঃ) এবং লর্ড ডাফরিনের শাসনকালে তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৮৫-৮৬ খ্রীঃ) সংঘটিত হয়। অতঃপর লর্ড কার্জনের (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীঃ) শাসনকালে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে একটি অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল।

ভুটান যুদ্ধের ফলে 'ভুটান দুয়ার' বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয় এবং উহা জলপাইগুড়ি জেলার একটি অংশে পরিণত হয়। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের ফলে আফগানিস্তানে বৃটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই ঘটনার গৌণ ফল হইল কোয়েটা অধিকার এবং বোলান গিরিবর্ত্মে বৃটিশ কর্তৃত্ব স্থাপন। এ-ছাড়া এই সময় সীমান্ত প্রদেশে কালাৎ রাজ্যে বৃটিশ প্রভাব বিস্তৃত হয়।

ভুটান যুদ্ধ ও দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ

ব্রহ্মদেশের বহুলাংশ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বৃটিশদের হস্তগত হয়। লর্ড ডাফরিনের শাসনকালে উত্তর ব্রহ্মের রাজা ছিলেন থিবো। এই সময়

বৃটিশদের ব্রহ্মদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ব্রহ্মরাজ ফরাসীদের সহিত চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছেন এই অজুহাতে ডাফরিন যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহা তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৮৫ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। যুদ্ধে বৃটিশ শক্তি জয়ী হইলে উত্তর ব্রহ্ম বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্জনের আমলে তিব্বত অভিযানের ফলে তিব্বতীরা পরাজিত হইয়া সন্ধি করে। রুশ ভীতিই ছিল এই যুদ্ধের প্রধান কারণ। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংরাজগণ বহু অর্থ লাভ করে এবং তিব্বতে বাণিজ্য বিষয়ে ইংরাজদের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হয়।

তিব্বত অভিযান

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার : উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নানাবিধ সমাজ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান ছিল খুব উচ্চে। কিন্তু পরবর্তী কালের



সতীদাহ প্রথা

স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নামিয়া গিয়াছিল। সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল ; হিন্দু-বিধবাকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জন করিতে হইত। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির

স্বভাবতঃই মার্কসবাদকে তিনি বিপ্লবের দর্শন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর অস্থায়ী সরকারের প্রশাসনিক অক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করিয়া লেনিন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাম্যবাদী সরকার (সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র) গঠন করেন। এইভাবে লেনিনের উদ্যোগে বল্‌শেভিক বিপ্লব সম্পন্ন হইল।

ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ঃ রাশিয়ায় শাসন-ক্ষমতা লাভ করিবার পর কমিউনিস্ট দলের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীর সকল জাতির উপরেই রক্তপতাকা উত্তোলন করা। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সঙ্ঘ বা কমিন্‌টার্ণ গঠিত হইল। ইহা ইতালি, জার্মানী, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট দলকে উৎসাহিত করিল ; মস্কো হইতে পরিচালিত কমিন্‌টার্ণের মধ্যে সকলকেই আনিতে চাহিল। সর্বত্রই গণতন্ত্র শাসনকে উল্টাইয়া দিতে চাহিল, প্রধান মতলব হইল বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করা। প্রথম প্রথম কমিউনিস্ট দল এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছিল, কোথাও তাহারা রাজনৈতিক বিপ্লব আনিয়াছিল, কোথাও শ্রমশিল্পের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল।

এছাড়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পাশাপাশি সাম্যবাদী রাশিয়ার অবস্থান অসম্ভব, অন্ততঃ একটির বিনাশ অনিবার্য, লেনিনের এই তত্ত্ব ও উহার প্রচার পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই কারণে ধনতন্ত্রী দেশগুলি একদিকে যেমন উত্থানের মুখেই সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অপরদিকে তাহারা কিন্তু স্ব স্ব দেশে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান রোধ করিতে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিল। এমন কি, ত্রিশের দশকে ইতালিতে ফ্যাসিবাদ ও জার্মানীতে নাৎসীবাদের উত্থানও রুশ বিপ্লবের পরোক্ষ ফল বলিয়া গণ্য করা হয়, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বের কোথাও কোন স্থায়ী সাম্যবাদী সরকার গঠিত হয় নাই। কেবলমাত্র হাঙ্গেরীতে বেলা কুনের নেতৃত্বে এক ক্ষণস্থায়ী সাম্যবাদী সরকার গঠিত হয় (১৯১৯ খ্রীঃ)।

চীন, ভারত

ইতিমধ্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে চীনে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্টদের উত্থান ঘটিতে থাকে। এমতাবস্থায় চীনের অন্যতম নেতা সান্ ইয়াৎ সেন রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলের নির্দেশে কুয়োমিন্ তাঙ্ দলকে পুনর্গঠনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রুশ বিপ্লব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সংগ্রামী মানুষের মনোবল বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। এ-ছাড়া আফ্রো-এশিয়ার অপরাপর পরাধীন ও ঔপনিবেশিক শোষণে নিপীড়িত দেশগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বভাবতঃই রুশ বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. রুশ-বিপ্লব বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ঘটনা। কারণঃ স্বৈরাচারী জারতন্ত্র—সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব প্রভৃতি।

২. ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পেত্রোগার্ড শহরে গণ-অভ্যুত্থান বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়। অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন।

৩. লেনিনের নেতৃত্ব—মার্কসবাদে বিশ্বাস, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাম্যবাদী সরকার গঠন।

৪. সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ত্রাসের সঞ্চার। চীন, ভারত প্রভৃতি অপরাপর দেশের সংগ্রামী মানুষের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। রুশ-বিপ্লবের কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(১) রুশ-বিপ্লবের পশ্চাতে বুদ্ধিজীবীদের অবদান কি ছিল? (২) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলাফল কি হইয়াছিল? (৩) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর বিপ্লবে লেনিনের কি ভূমিকা ছিল?

বিষয়মুখী ঃ

এক কথায় উত্তর দাও ঃ (ক) রাশিয়ার সম্রাটের কি উপাধি ছিল? (খ) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ডুমার বিরোধী সদস্যগণ কোন্ দলভুক্ত ছিলেন? (গ) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ বিপ্লবের সময় কোন্ শহরে গণ-অভ্যুত্থান হইয়াছিল?

সহায়তায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এই নিষ্ঠুর প্রথা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে আইনের দ্বারা রহিত করিয়া দেন। ভারতের কোথাও কোথাও দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন করিয়া উহারও উচ্ছেদ সাধন করা হয়।

'সতীদাহ প্রথা'র উচ্ছেদ সাধন

হিন্দু সমাজে তখন আরও আরও অনেক কুপ্রথা চালু ছিল। হিন্দুদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যু হইলে অতি অল্পবয়স্কা বিধবা নারী আর বিবাহ করিতে পারিতেন না, সারাজীবন বিধবা অবস্থায় কাটাইয়া দিতেন। দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই দারুণ দৃশ্যে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তাঁহার প্রচেষ্টায় ও তাঁহার মতানুযায়ী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসীর আমলে হিন্দু বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত করিয়া বিধবা-পুনর্বিবাহ আইন পাস করা হইল।

বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধকরণ



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও আনুষঙ্গিক সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে ইংরাজ রাজত্ব-কালে ভারত-শাসনে অনেক বাহ্যিক চাকচিক্য দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এই চাকচিক্যের অন্তরালে ভারতবাসীর বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব ক্রমেই তীব্র হইতেছিল।

ভারতে বৃটিশ শাসন প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করিয়াছিল। আগেকার সমাজব্যবস্থা গ্রাম্য জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রামগুলিতে লোকের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদিত হইত। কাহাকেও গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইত না। ইংরাজ শাসনের প্রভাবে ভারতীয় সমাজে একটি

নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই শ্রেণীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীতে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল। গতানুগতিকতার স্থলে ইহারা যুক্তি-তর্কের দ্বারা সকল কিছুর মূল্যায়নে তৎপর হইল। ফলে ইংরাজ শাসনের সমালোচনামূলক প্রখর রাজনৈতিক আলোচনা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল।

সমাজব্যবস্থায় ভাঙন : মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব

অর্থনৈতিক সমস্যাই ছিল ভারতবাসীর অসন্তোষের মূল কারণ। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর দৃষ্টিতে ইংরাজ শাসন ছিল শোষণেরই নামান্তর। ইংরাজ শাসনে দেশীয় শিল্পের অবনতির ফলে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকেরা এখন হইতে কৃষির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ইহাতে কৃষিক্ষেত্রে মজুরের সংখ্যাধিক্য ঘটে এবং ক্রমে এক ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব হইল। এদিকে ইংরাজদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চপদে শ্বেতকায়দের একচেটিয়া আধিপত্যের ফলে শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি হইল। তখন আইন ব্যবসায় এবং শিক্ষকতাই হইল তাহাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। কিন্তু ক্রমশঃ ইহাতেও সংখ্যাধিক্য দেখা দিলে শিক্ষিত বেকার সমস্যা এক জটিল আকার ধারণ করিল।

অর্থনৈতিক অসন্তোষ

বৃটিশ শাসনের উৎপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটনে সেকালের দেশীয় সংবাদপত্রগুলির উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু কেবলমাত্র সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের জনমত গঠন সম্ভব নহে, প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক সংগঠনের। রাজনৈতিক সংগঠন অবশ্য ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমনে বৃটিশ সরকার যে নির্মম উৎপীড়ন ও অত্যাচার করেন তাহাতে ভারতবাসীর মনোবল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহাদের সংগঠন প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ভারত সভা' নামে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয়।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

রাজনৈতিক সংস্থা

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর জার — নামে এক পার্লামেণ্ট স্থাপন করেন। (২) রুশ পার্লামেণ্টের বিরোধী গোষ্ঠী — দল নামে অভিহিত হইত। (৩) জার তাঁহার — পরামর্শ ছাড়া এক পাও নড়িতে পারিতেন না। (৪) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে — ছিল জনতার প্রকৃত প্রতিনিধি।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) রাশিয়ার রুশ ছাড়া অন্যান্য কোন্ কোন্ প্রধান জাতি বাস করিত? (২) রাশিয়ায় কোন্ শ্রেণী প্রভুত্ব করিত? (৩) রুশ বিপ্লব কোন্ কোন্ সাহিত্যিকের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল? (৪) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে রাশিয়ায় কি ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

চতুর্দশ অধ্যায়

ইউরোপ (১৯১৯—১৯৩৯)

প্যারিসের শান্তিচুক্তি : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে পাঁচটি পৃথক সন্ধিপত্র দ্বারা পাঁচটি বিভিন্ন দেশের সহিত সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই পাঁচটি সন্ধিকে একসঙ্গে 'প্যারিসের শান্তিচুক্তি' বলে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন ভার্সাই নগরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদে (Hall of Mirrors at Versailles) জার্মানীর সহিত ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়; ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে 'সেণ্ট্ জার্মাইনের সন্ধি', ২৭শে নভেম্বর বুলগেরিয়ার সহিত 'নিউলির সন্ধি', ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন হাঙ্গেরীর সহিত 'ট্রিয়ানানের সন্ধি' এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট তুরস্কের সহিত 'সেভার্স-এর সন্ধি' স্বাক্ষরিত হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি

ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানীর বহু ভূ-ভাগ ও জনগণ অন্য দেশের অধিকারে চলিয়া যায়। জার্মানী ফ্রান্সকে আল্‌সেস-লোরেন প্রদেশ, বেলজিয়মকে ইউপেন ও মালমেডি শহর, লুথিয়ানাকে মেমেল শহর এবং পোল্যাণ্ডকে পোজেন প্রদেশ ও পশ্চিম প্রাশিয়ার কতকটা স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং সেইসঙ্গে আরও স্থির হইয়াছিল যে, গণভোট সাপেক্ষে সাইলেশিয়ার উত্তরাংশ এবং পূর্ব প্রশিয়ার দক্ষিণাংশ পোল্যাণ্ডকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহা ছাড়া, জার্মানীকে বাল্টিক বন্দর, ডানজিক নগর ও তৎসংলগ্ন ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল এবং পনর বৎসরের জন্য সার্ অঞ্চলকে লীগ অব নেশন্স্-এর অধীনে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। জার্মানীর সমস্ত উপনিবেশ কাড়িয়া লইয়া আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে (mandate) স্থাপন করা হইয়াছিল।

(১) ভার্সাই সন্ধি

সেণ্ট্ জার্মাইনের সন্ধির দ্বারা অস্ট্রিয়াকে হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং দক্ষিণ টাইরল ও ট্রিয়েষ্ট ইতালিকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল।

(২) সেণ্ট্ জার্মাইন-এর সন্ধি

এদিকে তদানীন্তন ভাইস্‌রয় লর্ড লিটন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মাতৃভাষা সংবাদপত্র আইন' নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এই সংবাদপত্রগুলিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করিলেন। পরবর্তী ভাইস্‌রয় লর্ড রিপনের আমলে স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু এই সময় ইল্‌বার্ট বিল-সংক্রান্ত বিষয়ে ইংরাজদের চরম ঔদ্ধত্য ভারতবাসীকে সংগঠিত আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে অবহিত করে। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলেই ইংরাজগণ এই আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। ফলে শিক্ষিত ভারতবাসী একথা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল যে, একমাত্র সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব।

মাতৃভাষা সংবাদপত্র আইন

ইল্‌বার্ট বিল


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এইভাবে জাতীয় আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতেছে দেখিয়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এই আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় প্রবাহিত করিতে সচেষ্ট হন। ফলে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী আনুকূল্যে বোম্বাই-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস.। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৭২ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন।

জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম

কংগ্রেসের কার্যধারা ঃ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসন-পদ্ধতির নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন ও দেশের উন্নতি বিধানই ছিল প্রথমদিকে কংগ্রেসের মূল আদর্শ। এই উদ্দেশ্যে

সরকারের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকরী হইত না। ক্রমে কংগ্রেসের অধিবেশনে সরকারী নীতির সমালোচনা বৃদ্ধি পাইলে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিল। কংগ্রেসকে তাহারা সরকার-বিরোধী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ভাবিতে শুরু করিল।

চরমপন্থী আন্দোলন : ক্রমে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সরকার-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সদস্যদের একাংশ কংগ্রেসের বিনতি-পূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এই সময় মহারাষ্ট্র দেশের বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে এক চরমপন্থী দল গঠিত হইল। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভারত হইতে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করা। বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় তিলকের প্রধান সহযোগী ছিলেন।



বাল গঙ্গাধর তিলক

চরমপন্থীরা স্থির করিলেন যে, দেশের অভাব-অভিযোগ লইয়া আন্দোলন করিয়া দেশের লোককে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। শীঘ্রই ইহার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। এতদিন বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা একজন ছোটলাটের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছিল। বড়-

বঙ্গবিভাগ

লাট লর্ড কার্জন শাসনকার্যে সুবিধার অজুহাতে বাংলা দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিলেন। বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্বভাগ এবং আসাম একত্র



লর্ড কার্জন

করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠিত হইল এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশ লইয়া 'বঙ্গদেশ' গঠিত হইল। ইহাতে বঙ্গদেশ দুই ভাগ হইয়া গেল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর লর্ড কার্জন বঙ্গ-বিভাগ ঘোষণা করিলেন।

বঙ্গদেশকে এইরূপে দুই ভাগে ভাগ করায় বাঙ্গালীরা মনে করিল যে, বাঙ্গালী জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তাহাদের জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করা হইতেছে। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য দেশময় প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। আইনসঙ্গত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পণ্য-দ্রব্যও বর্জিত হইল। ইহাই 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে খ্যাত। এই সময় চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা জনমানসে বিদ্রোহের সঞ্চার করিয়াছিল। দেশের লোকে বিলাতী কাপড় পরা ছাড়িয়া দিল। দেশময় সভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং চলিতে লাগিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন



বিপিনচন্দ্র পাল

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে গোখেলের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেস বাংলার এই আন্দোলন সমর্থন করায় উহা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল। এই জাতীয় আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের চরমপন্থী দল ক্রমশঃ অধিক শক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল। চরমপন্থিগণ স্বরাজ লাভ কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান আদর্শ হইবে বলিয়া দাবি করিতে থাকে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে চরমপন্থি দল বাল গঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি দির্বাচিত করিলেন; নরমপন্থীরা বাংলার খ্যাতনামা উকিল রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিলেন। সুরাট কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল ও কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দল হইল।

সুরাট কংগ্রেস—কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দল

সরকার বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বিপ্লবী দল ও চরমপন্থী যুবকদল হিংসাত্মক বিপ্লবের দিকে ধাবিত হইল। বিপ্লববাদীরা গুপ্ত সমিতি গঠন করিল, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিল, বোমা তৈয়ারি করিল এবং সরকারী কর্মচারীদের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইল।



লালা লাজপৎ রায়

ইতিমধ্যে চরমপন্থীদের অন্যতম নেতা লালা লাজপৎ রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া মান্দালয়ে দ্বীপান্তরে পাঠান হইয়াছিল। পর বৎসর বাল গঙ্গাধর তিলক ও বাংলার অন্যান্য নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

এইভাবে চরমপন্থী আন্দোলন দমন করিয়া সরকার তোষণ ও ভেদনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সংস্কার আইন প্রবর্তিত হইল। ভারত-সচিব মর্লে ও বড়লাট মিণ্টোর নামানুসারে ইহা 'মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার' নামে পরিচিত। এই সংস্কার অনুযায়ী প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলিতে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ইহাতে নরমপন্থীরা সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই সঙ্গে ভেদমূলক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তন করা হয়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন—ভেদনীতি প্রবর্তন

স্বভাবতঃই জাতীয় বিক্ষোভ প্রশমিত হইল না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অবস্থায় জাতীয় আন্দোলন প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হইল। ইহার ফলে জনমত ও গণ-আন্দোলনের জয়জয়কার হইল। বিপ্লবী আন্দোলন আরও তীব্র হইল।

বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ভারতীয়দের পরাজয় এবং ঐ সঙ্গে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনেরও অবসান।

২. সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, ভারতের অভ্যন্তরে আর কোন বড় রকমের যুদ্ধ নীতি পরিত্যক্ত—সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ।

৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষীদের উদ্যোগ—সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধকরণ।

৪. পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণ ও আনুষঙ্গিক সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়দের চেতনার উন্মেষ। বৃটিশ শাসনের দোষত্রুটি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টিভঙ্গী—দেশবাসীর নানা ধরনের অসন্তোষ সম্পর্কে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠন, লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ—ইলবার্ট বিল—ভারতীয়দের মনে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনার সঞ্চার। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

৫. প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেস কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে সংস্কার আদায়ের চেষ্টা। ক্রমে কংগ্রেস দলে সরকারের বিরূপ সমালোচনা। মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থী দল গঠন। বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়ের নূতন দলে যোগদান। লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ—চরমপন্থীদের কার্যকলাপে তৎপরতা বৃদ্ধি।

৬. চরমপন্থী দলে বিভেদ—সুরাট কংগ্রেস। চরমপন্থী আন্দোলন দমনের জন্য সরকার কর্তৃক তোষণ ও ভেদনীতি প্রবর্তন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সমাজ সংস্কার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ২। বৃটিশ শাসনে ভারতে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। ৩। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চরমপন্থী দলের কার্যাবলী সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর বৃটিশ শক্তি কিভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিল? (২) কিভাবে সতীদাহ প্রথার অবসান হইয়াছিল? (৩) কিভাবে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও : (ক) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারত শাসন-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব কাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল ? (খ) কাহাদের সহায়তায় বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা রোধ করিয়াছিলেন ? (গ) কে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ভারতে — রাজত্ব আর রহিল না। (২) — শাসনকালে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ হয়। (৩) লর্ড ডাফরিনের সময় উত্তর ব্রহ্মের রাজা ছিলেন —। (৪) — আইনের দ্বারা সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। (৫) — প্রমাণ করিলেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। (৬) — আমলে ভারতে স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। (৭) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতার নাম —। (৮) মহা-রাষ্ট্রের — নেতৃত্বে চরমপন্থী দল গঠিত হয়।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ভারতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে কি নামে অভিহিত করা হইত ? (২) কাহার শাসনকালে তিব্বত অভিযান হয় ? (৩) কোন্ বৎসর তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ হয় ? (৪) কাহার শাসনকালে বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয় ? (৫) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ? (৬) সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থীরা কাহাকে সভাপতি নির্বাচিত করেন ?

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

সূচনা : ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া এক বিরাট যুদ্ধ চলিয়াছিল। ইহাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়।

কারণ : এই যুদ্ধের জন্য পূর্বে কেবল জার্মানীকেই দায়ী করা হইত ; কিন্তু এখন জানা গিয়াছে ইউরোপের বড় বড় সব শক্তিগুলি এই যুদ্ধের জন্য অল্পবিস্তর দায়ী। এত বড় একটি যুদ্ধ কোন একটি কারণে ঘটে নাই। ইহার পরোক্ষ কারণগুলি বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের দায়িত্ব

পরোক্ষ কারণের মধ্যে এইগুলি ছিল প্রধান : (১) অনেকদিন পূর্ব হইতেই ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি পরস্পর বিবদমান স্বার্থপর স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। (২) প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আক্রমণাত্মক উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্র আপন আপন সামরিক শক্তি ও সম্পদ বাড়াইয়া সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল।

(৩) **জার্মানীর দায়িত্ব :** এদিকে সমগ্র জার্মানী প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া ইউরোপের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। কেবল সামরিক বলেই নহে, বিজ্ঞানের বলেও জার্মানী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। জার্মানী মনে করিল যে, জগতের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ জাতি। সমগ্র জগতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বিস্মার্ক ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জার্মানীর শক্তি ও প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য তিনি বৈদেশিক নীতির দিকে বেশি ঝোঁক দিতেন। অতঃপর রক্ত ও অস্ত্রের নীতি ছাড়িয়া দিয়া তিনি শান্তি ও মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালির মধ্যে ত্রি-শক্তি চুক্তি স্থাপন করিলেন। বিস্মার্ক রাশিয়া ও ইংলণ্ডের সহিতও বন্ধুভাবে চলিতেন। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে, ফ্রান্স যেন কোনক্রমে জার্মানীর

শ্রেষ্ঠত্ব

উগ্র জাতীয়তাবোধ

ত্রি-শক্তি চুক্তি

বিরুদ্ধে অপর কোন শক্তির সাহায্য না পায়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন জার্মান সম্রাট বা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম অভিজ্ঞ রাজনীতিক বিস্‌মার্ককে পদচ্যুত করিলেন। বিস্‌মার্কের শান্তির নীতি ছাড়িয়া দিয়া কাইজার নূতন উগ্রনীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

উগ্রনীতি

(৪) **অন্যান্য রাষ্ট্রের হিংসা :** জার্মানীর অভ্যুদয়ে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের ঈর্ষা স্বতঃই বাড়িতে লাগিল। এই ঈর্ষার নানা কারণ ছিল। জার্মানী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, নৌ-শক্তি ও শিল্পবাণিজ্যে ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিল। জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধিতে তাহার চিরশত্রু ফ্রান্স নূতন আক্রমণ আশঙ্কা করিতেছিল। জার্মানী পূর্বদিকে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেছে দেখিয়া রাশিয়ারও ভয় হইল। ইতিপূর্বে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। এক্ষণে রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক চুক্তি (১৯০৭ খ্রীঃ) স্বাক্ষরিত হইলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হইল। ইউরোপ পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইল। যুদ্ধ অবশ্যই ঘটিবে জানিয়া উভয় পক্ষই আপন আপন সামরিক শক্তি বাড়াইয়া চলিল।

ইংলণ্ড ও জার্মানীর প্রতিযোগিতা

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ : এই সময়ে একটি সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ ফার্ডিন্যাণ্ড বসনিয়ার রাজধানী সারাজেভো শহরে আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। বহুসংখ্যক সার্বজাতীয় লোককে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে জোর করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেইজন্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্বদের একটি বিরুদ্ধ দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। অস্ট্রিয়া বলিল যে, এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে সার্বিয়ার প্ররোচনা রহিয়াছে। সুতরাং সার্বিয়াকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার নিকট কতকগুলি শর্ত দিয়া এবং তাহা অবিলম্বে পূরণের দাবি জানাইয়া এক চরম পত্র পাঠান হইল। সার্বিয়া এই অন্যায় দাবি পূরণ করিতে রাজী হইল না। তখন অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (২৮শে জুলাই)। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীও অস্ট্রিয়ার সহিত যোগ দিল। এদিকে

সারাজেভো হত্যাকাণ্ড

রাশিয়া, বল্‌কান অঞ্চলে তাহার প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য, সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। ফ্রান্স তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু রাশিয়ার সহিত যোগ দিল। জার্মানী ৩রা আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিবার জন্য নিরপেক্ষ বেলজিয়মের মধ্য দিয়া সৈন্যবাহিনী চালিত করিল। বেলজিয়ম আক্রান্ত হওয়ায় বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইল। পূর্বে এক সন্ধি দ্বারা সমস্ত রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, কেহই বেলজিয়মকে আক্রমণ করিবে না। এখন সেই নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হওয়ায় ইংলণ্ড ৪ঠা আগস্ট যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এইভাবে রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

যুদ্ধ ঘোষণা

যুদ্ধের ব্যাপকতা ঃ ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা হইতে এই যুদ্ধের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এই প্রথম এইরূপ মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়। বিজ্ঞানের বলে নূতন নূতন মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইল। ডুবো-জাহাজ, ট্যাঙ্ক, প্রকাণ্ড কামান, ইউবোট, বিষ বাষ্প, পরিখা যুদ্ধ, আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপ প্রভৃতি নূতন নূতন মারণাস্ত্র ও কৌশল প্রয়োগের ফলে এই যুদ্ধ অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিল। জলে, স্থলে ও আকাশে তুমুল যুদ্ধ চলিল। গ্যাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গ্যাসমুখোশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম জার্মানী প্রায় সর্বত্র জয়লাভ করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ বহুকাল ধরিয়া চলিতে থাকায় শেষ পর্যন্ত সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। জার্মানীর মিত্রশক্তিরা একে-একে আত্মসমর্পণ করিল। যুদ্ধের শেষ দিকে আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। জার্মানীতে খাদ্যাভাব ও নৌ-বিদ্রোহ দেখা দিল। কাইজার পদত্যাগ করিলেন। অগত্যা জার্মানী পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল।

বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল সর্বাত্মক যুদ্ধ। স্বভাবতঃই সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল। যুদ্ধে অজস্র লোকক্ষয় এবং বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশের বহু রেলপথ, সেতু ও কলকারখানা বিনষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় বোমা নিক্ষেপের ফলে বহু কৃষিক্ষেত্র অনাবাদী রহিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইল। স্বভাবতঃই যুদ্ধের পর বহু লোক কর্মহীন হইল। এ-ছাড়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপেও মানুষের জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া গেল। পৃথিবীব্যাপী তীব্র অর্থসঙ্কট দেখা দিল।

এই যুদ্ধের পরোক্ষ ফলাফলও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের ফলে রাজতন্ত্র অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং গণতন্ত্রের প্রসার ঘটিয়াছিল। এ-ছাড়া যুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রয়াস প্রশংসনীয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের সাহায্যদানের কারণ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত, ফলে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ঐ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ভারত সরকার এই যুদ্ধে ১২ কোটি ৭৬ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন। এ ছাড়া লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্য ঐ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। ভারত সরকারের এই সকল কার্যে স্বভাবতঃই ভারতবাসীর বাধা দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না। সেই কারণে ভারতীয়গণ সকল প্রকার বৃটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ হইতে বিরত ছিল। অধিকন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে বৃটিশ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। বস্তুত ভারতবাসীর এই আনুগত্য ও সমর্থন ইংরাজদের যুদ্ধজয়ে বিশেষ সাহায্য করে। এই সাহায্যদানের বিনিময়ে ভারতবাসী আশা করিয়াছিল যে যুদ্ধান্তে বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবে।

কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে আনুগত্য প্রদান

আর্থিক দুর্দশা ও গণ-অসন্তোষ ঃ যুদ্ধের সময় ভারতে বৃটিশজাত দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হইলে দেশজ শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিন্তু যুদ্ধান্তে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিল। অনেক কল-কারখানা বন্ধ হইয়া গেল এবং স্বভাবতঃই কাজকর্মের অভাব হইল। এই সঙ্গে খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভারতে গণ-অসন্তোষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের মোহভঙ্গ প্রকট হইয়া উঠিল। যুদ্ধ

চলাকালীন ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্রশক্তি এই যুদ্ধ গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ বলিয়া প্রচার চালাইতে থাকে, এমন কি পৃথিবীর সকল মানুষের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রক্ষা করিতেও তাহারা বদ্ধপরিকর বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু যুদ্ধান্তে মিত্রশক্তির কথা ও কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা দিল। এদিকে যুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবে রাশিয়ার সাধারণ মানুষের সাফল্য ভারতের জনগণের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জনসাধারণের চেতনা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল এবং এই সঙ্গে যুদ্ধোত্তর যুগের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যা পরাধীনতাজনিত অসন্তোষকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল।

দেশে-বিদেশে বিপ্লবীদের কার্যকলাপঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক পূর্বেই ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইহার প্রসার ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), রাসবিহারী বসু এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (মানবেন্দ্রনাথ রায়) নাম বিশেষতঃ স্মরণীয়। যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী উভয়েরই লক্ষ্য ছিল ভারতে যুগপৎ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটান। রাসবিহারী সমগ্র উত্তর-ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা স্থির করেন। এই সময় তিনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত 'গদর'-পার্টির লোকজনদের সাহায্যে সহায়তা লাভ করেন। বিপ্লব সফল করিবার উদ্দেশ্যে রাসবিহারী আম্বালা, রাওলপিণ্ডী প্রভৃতি স্থানের সেনানিবাসগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। স্থির হয় যে, গণ-অভ্যুত্থান শুরু হইলে সৈন্যবাহিনী ইহার সামিল হইবে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী পরিকল্পনা মত অভ্যুত্থানের দিন স্থির হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কৃপাল সিং নামক এক বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনার


রাসবিহারী বসু

কথা ফাঁস করিয়া দেয়। রাসবিহারী দেশ ত্যাগ করিয়া জাপানে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু অনেকে ধরা পড়িলেন।

এদিকে বিদেশ হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। স্থির হয় যে, ইংরাজদের শত্রু জার্মানী অস্ত্র সাহায্য করিবে। এইরূপ প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছিল। সেইমত যতীন্দ্রনাথ ঐ অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চারিজন সহকর্মীসহ বালেশ্বরের পথে রওনা হন। কিন্তু ইতিমধ্যে এই খবর ফাঁস হইয়া গিয়াছিল এবং কলিকাতার তদানীন্তন পুলিস কমিশনার টেগার্ট একদল সৈন্যসহ বালেশ্বরে উপস্থিত হন। অতঃপর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বুড়িবালাম নদীর তীরে উভয়পক্ষে এক তীব্র সংঘর্ষ হয়। যতীন্দ্রনাথ মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং কয়েকদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।



বাঘা যতীন

ভারতের বাহিরে বিপ্লবী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমেরিকার 'গদর'-পার্টির নাম উল্লেখ্য। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বসবাসকারী পাঞ্জাবীদের লইয়া এই দল গঠিত হয় এবং ইহার অন্যতম নেতা ছিলেন লালা হরদয়াল। এছাড়া এই প্রসঙ্গে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা প্রভৃতির নাম করা যায়। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ জার্মানীর সহায়তায় ভারত হইতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান চাহিয়াছিলেন।



মানবেন্দ্রনাথ রায়

হোমরুল আন্দোলন ঃ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল হোমরুল আন্দোলন। প্রখ্যাত ইংরাজনেতৃ অ্যানি বেসান্ত আয়ারল্যাণ্ডের হোমরুল লীগের অনুকরণে ভারতে ঐরূপ লীগ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমেই চরমপন্থী নেতা তিলক ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুণা শহরে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে অ্যানি বেসান্ত হোমরুল লীগ নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করেন। হোমরুল আন্দোলনের মূল কথা ছিল কংগ্রেসের বাহিরে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জনের জন্য দাবি উত্থাপন। এছাড়া জাতীয় আন্দোলনে উদ্দীপনার সঞ্চার করাও ছিল ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি। ইহার দ্বারা কংগ্রেস মুসলমান-দের স্বার্থে পৃথক নির্বাচনের দাবি মানিয়া লইল, পরিবর্তে মুসলিম লীগ স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য কংগ্রেসের সহিত যুগ্ম আন্দোলন গঠনে তৎপর হইল।

রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড

এদিকে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের 'ভারত সরকার আইন' প্রবর্তিত হইবার প্রাক্কালে বৃটিশ সরকার ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে 'রাওলাট আইন' বিধিবদ্ধ করিয়া দেশবাসীর উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলে সারা ভারত জুড়িয়া অসন্তোষের আগুন জ্বলিতে থাকে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাঙ্গামা হয় পাঞ্জাবে। সেখানে অমৃতসরের নিকটস্থ প্রাচীর-ঘেরা জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি শান্তিপূর্ণ সভায় ইংরাজ সেনাপতি ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। ইহার ফলে প্রায় সহস্রাধিক জনতা নিহত হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেশব্যাপী তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে। ইহার প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন ঃ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসচিব মণ্টেগু ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবিত সংস্কারের অন্তিম লক্ষ্যই হইবে ভারতের ক্রমপর্যায়ে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা। এই

সিদ্ধান্ত তিনি বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহিত একযোগে ঘোষণা করেন বলিয়া উহা 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট' নামে পরিচিত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই 'ভারত শাসন আইন' বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল দ্বৈরাজ্য অর্থাৎ এই আইন দ্বারা সরকার প্রদেশগুলিতে দ্বি-আঙ্গিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিল। যে সকল বিষয়ের ভার প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল সেগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। বিচার, জেল, পুলিস প্রভৃতি রহিল রক্ষিত বিভাগে, আর শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি রহিল হস্তান্তরিত বিষয়ের অঙ্গীভূত। রক্ষিত বিষয়-গুলি রহিল গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্যদের অধীনে, আর হস্তান্তরিত বিষয়গুলি দেশীয় মন্ত্রীদের অধীনে। এছাড়া স্থির হয় যে, কেন্দ্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট আইন-সভা প্রবর্তিত হইবে।

মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ: এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সুলতান মিত্রপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধান্তে তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ ঘটে। তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদিগের ধর্মগুরু বা 'খলিফা'। সুতরাং ভারতীয় মুসলমানগণ খলিফার মর্যাদা ও রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করে।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি: এই সময় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল গান্ধীজির আবির্ভাব। গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রথমেই জাতীয় কংগ্রেস খিলাফৎ দাবিকে সমর্থন জানায়। অতঃপর সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে গান্ধীজি অসহযোগের পন্থা নির্দেশ করেন।

জাতীয় নেতা হিসাবে গান্ধীজির উত্থান: ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দরে গান্ধীজির জন্ম হয়। তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিস্টার হন। অতঃপর দেশে ফিরিয়া কিছুকাল আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকালে তিনি ঐ সরকারের জাতিবৈষম্য ও বর্ণ-বিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহাতে সিদ্ধিলাভ করার ফলে তিনি সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন (১৯১৫ খ্রীঃ) গান্ধীজি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথমে তিনি রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর হইতে গান্ধীজিই হইলেন জাতীয় আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—যুদ্ধের কারণ : প্রত্যেক রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক উগ্র-জাতীয়তাবাদ, সামরিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, একপক্ষে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালির মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি, অন্য পক্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া—পরস্পর-বিরোধী জোট গঠন।

২. যুদ্ধের প্রকৃতি : ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ অপেক্ষা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল অনেক সর্বাত্মক ও ব্যাপক—নূতন নূতন মারণাস্ত্র, ডুবো জাহাজ, ট্যাঙ্ক, ইউবোট—জল, স্থল ও আকাশে তুমুল যুদ্ধ।

৩. বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের সাহায্যদান—১৯১৪ মাদ্রাজ অধিবেশন—কংগ্রেসের প্রস্তাবে বৃটিশ সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।

৪. যুদ্ধান্তে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে মন্দা, খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে ভারতীয়দের মোহভঙ্গ—মিত্রশক্তির কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য—যুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা রুশ বিপ্লবের সূচনা।

৫. যুদ্ধ চলাকালীন ভারতে বিপ্লবী কার্যকলাপ—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু প্রভৃতির নেতৃত্ব— ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সম্পাদনের চেষ্টা।

৬. ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল আন্দোলন—বাল গঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেসান্ত—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলন : লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদন।

৭. ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রাওলাট আইন' প্রবর্তন—দমননীতি, 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড'। দেশব্যাপী আলোড়ন।

৮. ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন : দ্বিআঙ্গিক শাসন প্রতিষ্ঠা। খিলাফৎ আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি—জাতীয় নেতা গান্ধীজির উত্থান।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি ছিল? ২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কিভাবে জার্মানীর উদ্যোগে ত্রি-শক্তি চুক্তি স্থাপিত হইয়াছিল? (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল? (৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে আর্থিক দুর্দশা কিভাবে গণ-অসন্তোষে রূপান্তরিত হয়? (৪) কিভাবে হোমরুল লীগ সংগঠিত হইয়াছিল?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও : (ক) সারাজেভোর হত্যাকাণ্ডে কে নিহত হইয়াছিলেন? (খ) কোন্ বৎসর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল? (গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে কি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? (ঘ) বাঘাযতীনের সহিত ইংরাজদের কোথায় শেষ সংঘর্ষ হইয়াছিল? (ঙ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী — ও — মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। (২) — বিসমার্ককে পদচ্যুত করিলেন। (৩) জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধিতে — নূতন আক্রমণের আশঙ্কা করিতেছিল। (৪) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ — বসনিয়ার রাজধানী — শহরে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। (৫) যতীন্দ্রনাথ ও — উভয়েরই লক্ষ্য ছিল ভারতে যুগপৎ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটান। (৬) — নদীর তীরে সংঘর্ষে যতীন্দ্রনাথ মারাত্মকভাবে আহত হন। (৭) ভারতে — দমনের উদ্দেশ্যে রাওলাট আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। (৮) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে — নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

নিউঈলির সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়া রুমানিয়াকে দোব্রুজা, যুগোশ্লাভিয়াকে ম্যাসিডোনিয়ার অধিকাংশ এবং গ্রীসকে থে্রসের উপকূল-ভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

(৩) নিউলির সন্ধি

ট্রিয়ানানের সন্ধি দ্বারা হাঙ্গেরী চেকোশ্লোভাকিয়াকে শ্লোভাক অঞ্চল, রুমানিয়াকে ট্রান্‌সিলভ্যানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াকে ক্রোশিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেভার্স-এর সন্ধি দ্বারা তুরস্ক সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও মিশরের উপর প্রাধান্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইউরোপের মধ্যে কেবলমাত্র কনস্তান্তিনোপল নগর তুরস্কের অধীনে রহিল। কিন্তু শেষোক্ত সন্ধি কার্যকরী হয় নাই।

(৪) ট্রিয়ানান-এর সন্ধি

(৫) সেভার্স-এর সন্ধি

ইউরোপের পুনর্গঠন ঃ প্যারিসের সন্ধির ফলে ইউরোপের মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন হইল এবং অনেক নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। অস্টি্রয়া সাম্রাজ্য মানচিত্র হইতে মুছিয়া গেল। এককালে যাহা বিরাট সাম্রাজ্য ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ছয়টি নূতন রাজ্যে পরিণত হইল। যথা—অস্টি্রয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লো-ভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড এই চারিটি প্রজাতন্ত্র এবং রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া এই দুইটি রাজশাসনাধীন রাজ্য।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ভাঙন

রুশ-সাম্রাজ্য, অস্টি্রয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত না হইলেও এই রাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যা অনেক হ্রাস পাইল। রুশ সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগ হইতে ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া—এই চারিটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গঠিত হইল এবং পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ ভূ-ভাগ রাশিয়া হইতে চলিয়া গেল। বেসারাবিয়া প্রদেশ রুমানিয়ার সহিত সংযুক্ত হইল।

চারিটি নূতন রাষ্ট্র

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপেও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইল। সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো মানচিত্র হইতে অদৃশ্য হইল। এই দুইটি দেশ ও অস্টি্রয়া-হাঙ্গেরীর স্লাভ-অধ্যুষিত দক্ষিণাংশ লইয়া যুগোশ্লাভিয়া রাজ্য গঠিত হইল। রুমানিয়া রাজ্যের সহিত ট্রান্‌সিলভেনিয়া ও পূর্ব হাঙ্গেরীর কতকাংশ যুক্ত

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে পরিবর্তন

হইল। বুলগেরিয়ার ইজিয়ান সাগরের উপকূল গ্রীসের সহিত সংযুক্ত হইল। ইউরোপের কনস্তান্তিনোপল ও সমগ্র এশিয়া মাইনর তুরস্কের অধীনে রহিল। এশিয়া মাইনরের দক্ষিণে তুরস্ক তাহার অধিকারগুলি হারাইল। ফ্রান্স সিরিয়া অধিকার করিল। ইংলণ্ড মেসোপটেমিয়া দখল করিল এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের নূতন রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। মিশরে তুরস্কের যে নামেমাত্র অধিকার ছিল তাহাও লোপ পাইল এবং মিশর ইংলণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণে আসিল। তুরস্কের বাকী অধিকারগুলিতে আরব রাজাদের অধীনে বহু স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব : যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর শান্তিচুক্তি করা হইয়াছিল তাহাতে শান্তির অনুকূল পরিবেশ রহিল না। যুদ্ধে জয়ী হইয়াও যুদ্ধোত্তর ইতালি ছিল বঞ্চিত ও হতাশাগ্রস্ত। দেশ-ব্যাপী খাদ্যাভাবের ফলে কৃষককুল ক্রমশঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা জমিদারের খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল। অচিরেই শ্রমিকগণ ধর্মঘট শুরু করিল। ক্রমে ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য জোরদার হইয়া উঠিল। আর এদিকে পরাজিত জার্মানী হইল অপমানিত, ঋণগ্রস্ত এবং ক্ষুব্ধ। ক্রমে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল। স্বভাবতঃই এই সময় ইতালি ও জার্মানীর নির্যাতিত জনগণকে যে-কেহ আশার বাণী শুনাইল তাহাকেই তাহারা নেতা বলিয়া অনুসরণ করিল।

ফ্যাসিবাদের অনুকূল পরিবেশ

সুতরাং পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া ইতালির জননায়ক মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট নামে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী দল গঠন করিলেন। প্রাচীন যুগে রোমান কনসালগণের শৃঙ্খলা ও শক্তির চিহ্নস্বরূপ লিক্টরগণ 'ফ্যাসিস্' রজ্জুবদ্ধ দণ্ড বহন করিত। এই ফ্যাসিস্ শব্দ হইতে দলের নাম হইল ফ্যাসিস্ট।

মুসোলিনীর উত্থান

ফ্যাসিজ্‌মের আদর্শ হইল রাষ্ট্রের সকল প্রজা ও তাহাদের সমস্ত কার্যাবলীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। কারণ রাষ্ট্র হইল সর্বশক্তিমান, ইহার বাহিরে ব্যক্তি বা দলের স্বাধীনতার কোন স্থান নাই।

ফ্যাসিজ্‌মের আদর্শ

ফ্যাসিস্ট দল কালো পোশাক পরিধান করিত এবং তাহারা বিশেষ ধরনের কুচকাওয়াজ ও শৃংখলা দ্বারা সুসংগঠিত বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল।

ফ্যাসিস্ট বাহিনীর রোম অভিযান

অচিরেই এই দলের কার্যকলাপে ছাত্র ও যুবকেরা আকৃষ্ট হয়। ক্রমে এই দল এরূপ শক্তি সঞ্চয় করিল যে, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফ্যাসিস্ট বাহিনী রাজধানী রোমের দিকে অগ্রসর হইল। রাজা বেগতিক দেখিয়া মুসোলিনীকে প্রধান মন্ত্রী হইতে এবং তাঁহার ইচ্ছামত মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান জানাইলেন। এইভাবে ক্ষমতা দখল করিয়া মুসোলিনী স্বয়ং স্বেচ্ছাচারী শাসক হইলেন এবং ইতালিতে ফ্যাসিজ্‌ম প্রতিষ্ঠা করিলেন।



বেনিটো মুসোলিনী

ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থায় অচিরেই কৃষি, শিল্প ও অপরাপর জাতীয় উন্নয়নের ফলে ইতালিতে ব্যাপক উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ব্যবস্থায় সবকিছুর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইল। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্টগণ শান্তির বিরোধী ছিল।

নাৎসী দল: ইতালির ফ্যাসিস্ট দলের ন্যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানীতেও নাৎসী নামে এক অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

হিটলারের উত্থান ও নাৎসী দলের শক্তিবৃদ্ধি

এই দলের নেতা ছিলেন হিটলার। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ লইয়া জার্মানীতে প্রথমে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু অচিরেই হিটলারের নেতৃত্বে ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্ট পার্টি বা নাৎসী দল শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তাহারা বিত্তশালীদের ভয় দেখাইল যে, কমিউনিস্ট দল শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া রাশিয়ার ন্যায় তাহাদের ধন-সম্পদ কাড়িয়া লইবে। যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে তখন প্রজাতন্ত্র শাসন

বলবৎ ছিল। হিটলার জ্বলন্ত ভাষায় ভার্সাই সন্ধির নিন্দা করিয়া এবং প্রজাতন্ত্র শাসনের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা উল্লেখ করিয়া দেশের যুবশক্তিকে নাৎসী দলে টানিয়া লইলেন। এ-ছাড়া অবসরপ্রাপ্ত সেনাদল ও হতাশা-গ্রস্ত যুব-সমাজকে সংগঠিত করিয়া নাৎসী দলের একটি সেনাবাহিনী গঠিত হয়। অতঃপর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জার্মান রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভু হইলেন। কমিউনিস্ট,



হিটলার

হিটলার কর্তৃক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি অপরাপর রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ক্রমে শাসনক্ষমতা একটিমাত্র রাজনৈতিক দল—নাৎসীদের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল এবং হিটলারের একনায়কত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

জাতিসংঘ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভবিষ্যৎ শান্তির ভিত্তি হিসাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন যে-চৌদ্দটি শর্তের উল্লেখ করেন তন্মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা।

উৎপত্তি

অতঃপর যুদ্ধান্তে সন্ধি স্থাপিত হইলে জাতিসংঘের চুক্তিপত্র প্রতিটি সন্ধির অংশীভূত হইল। এইভাবে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের জন্ম হয় এবং পর বৎসর জানুয়ারী মাসে ইহা সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য ও সাফল্য

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হইল সমস্ত জাতির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা, আন্তর্জাতিক বিরোধ মিটমাটের মাধ্যমে যুদ্ধ নিবারণ করা। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সংস্থার সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। এই সময় আল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের অধিকার লইয়া ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের (১৯১০-২১), ভিল্না লইয়া পোল্যাণ্ডের সহিত লিথুয়ানিয়ার বিরোধ

(১৯২০-৩০) জাতিসংঘের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এ-ছাড়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের অধীন কার্ফু দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া ইতালি ও গ্রীসের বিবাদের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ যথেষ্ট সফলতা অর্জন করিয়াছিল। বিশেষত, ১৯২৪ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যর্থতা : জাতিসংঘের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মার্কিন সেনেটের আপত্তি-হেতু মার্কিন সরকারের জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণে অনীহা। ইহার ফলে প্রথম অবস্থাতেই জাতিসংঘ অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এ-ছাড়া পরাজিত শক্তি হিসাবে জার্মানী ও সাম্যবাদী দেশ বলিয়া রাশিয়াকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত না করা জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বিবেচ্য। পরে ঐ দুই রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হইলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে ইতিমধ্যেই নানা গোলযোগ দেখা দিয়াছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদে অনীহা

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইতালি ও জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসীবাদের উত্থান এবং জাপানে সাম্রাজ্যবাদ সুদৃঢ় হইবার পর হইতে জাতিসংঘের ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় বড় বড় রাষ্ট্রসমূহ শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘে যোগ দিয়াও তাহাদের আপন আপন স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে নাই। জাতিসংঘের এমন কোন ক্ষমতা ছিল না যদ্দারা ইহা বড় বড় রাষ্ট্রগুলির অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারে। এইজন্য জাতিসংঘ শান্তি রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে বা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করিয়া রাজধানী আদ্দিস্ আবাবা দখল করিলে (১৯৩৬ খ্রীঃ) জাতিসংঘ কোন কার্যকরী ভূমিকা লইতে পারিল না। অতঃপর জার্মানীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। পরিশেষে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল তখন আপনা-আপনি জাতিসংঘের অবসান ঘটিল।

বড় বড় রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থত্যাগে অনীহা

জাপান ও ইতালির সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তা

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি (১৯১৮ খ্রীঃ) এবং প্যারিসের শান্তিচুক্তি (১৯১৯ খ্রীঃ)—মোট পাঁচটি চুক্তি তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য জার্মানীর সহিত মিত্রপক্ষের চুক্তি তথা ভার্সাই-এর সন্ধি।

২. ইউরোপের পুনর্গঠন—অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অবসান—চারিটি নূতন রাষ্ট্রের জন্ম, অন্যান্য পরিবর্তন।

৩. ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উন্মেষ, ইতালি ও জার্মানীতে যথাক্রমে মুসলিনি ও হিটলারের নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৪. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের প্রস্তাবমত ১৯১৯ সালে জাতি-সংঘের জন্ম : আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়াস।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা কর। ২। প্যারিসের শান্তি-চুক্তি অনুযায়ী ইউরোপের পুনর্বণ্টন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৩। কিভাবে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ইতালিতে ফ্যাসিবাদ ও জার্মানীতে নাৎসী-বাদের উদ্ভব হইয়াছিল ? ৪। জাতি-সংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক :

(১) ভার্সাই সন্ধি সম্পর্কে কি জান ? (২) কিভাবে মুসোলিনী ইতালিতে এক-নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ? (৩) জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ কি ছিল ?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও : (ক) মিত্রশক্তির সহিত জার্মানীর সন্ধি কি নামে পরিচিত ? (খ) কে জার্মানীতে নাৎসীবাদ চালু করিয়াছিলেন ? (গ) কোন্ রাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদানে অনীহা প্রকাশ করিয়াছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর জার্মানীর সহিত — চুক্তি ও তুরস্কের সহিত — চুক্তি সম্পাদিত হয়। (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর — সাম্রাজ্য মানচিত্র হইতে

মুছিয়া গেল। (৩) ফ্যাসিজ্‌মের আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র হইল —। (৪) — ইতালিতে ফ্যাসিজ্‌ম প্রতিষ্ঠা করেন। (৫) জার্মানীতে — একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। (৬) জাতিসংঘের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ — সরকারের ঐ সংঘের সদস্যপদ গ্রহণে অনীহা।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও ঃ

(১) প্যারিসের সন্ধি কাহাকে বলে? (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মানীর উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লইয়া কাহার তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল? (৩) প্রাচীনকালে ফ্যাসিস্‌ কথাটি কি কারণে ব্যবহৃত হইত? (৪) জার্মানীর ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্ট পার্টিকে এককথায় কি বলা হইত? (৫) যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্বে কি শাসনব্যবস্থা বলবৎ ছিল? (৬) কোন্ বৎসর জাতিসংঘের জন্ম হইয়াছিল?

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

সূচনা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের একুশ বৎসর পর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

কারণ : অনেকে মনে করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই নিহিত ছিল। জার্মানী ও মিত্রশক্তির মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে যুদ্ধের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী করিয়া তাহার উপর অতি কঠোর ব্যবহার করা হইয়াছিল। এই সন্ধিতে জার্মানীর মতামত লওয়া হয় নাই। সন্ধির শর্তগুলি জার্মানীর ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হয় এবং জার্মানীকে নিরস্ত্র করা হয়। এ ছাড়া ক্ষতিপূরণস্বরূপ বহু দাবি জার্মানীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল কারণে প্রথম হইতেই জার্মানী ভার্সাই সন্ধিকে "জবরদস্তি সন্ধি" বলিয়া মনে করিত এবং উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছিল।

ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি

'জবরদস্তি সন্ধি'

ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি বজায় রাখিতে হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে একমতে চলিতে হইত। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না বরং ইহারা পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। এ ছাড়া ভার্সাই সন্ধি রুশ, জার্মান ও অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভাঙিয়া উহার স্থলে কতিপয় ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ সকল খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যের আত্মরক্ষার শক্তি ছিল এবং ঐ রাজ্যগুলি ছিল প্রাকৃতিক সীমারেখা-বর্জিত। এক্ষণে এই সমুদয় রাজ্য জার্মানীর প্রতিবেশী রাজ্য হওয়ায় প্রথম হইতেই জার্মানীর আগ্রাসী নীতি সফল হইয়াছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী অনৈক্য

খণ্ড, ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম মূল কারণ ছিল হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী নীতি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীতে নাৎসী দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

জার্মানীর আগ্রাসী নীতি

হিটলার প্রথমেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব অস্বীকার করিলেন এবং ভার্সাই সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয় টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ফ্যাসিস্ট ভাবধারার সম্প্রসারণ—ইতালি ও জাপানের সাম্রাজ্য-লিপ্সা

ইতিমধ্যে ইতালিতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ইতালি নূতন নূতন রাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হয়। অচিরেই ইতালি উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া এবং ইউরোপে আলবেনিয়া দখল করে। ইতিমধ্যে এশিয়া খণ্ডে ফ্যাসিস্ট ভাবধারা প্রসারিত হয় এবং ইহার ফলে জাপান চীন আক্রমণ করিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করে। এক্ষণে আপন আপন অধিকার বাড়াইবার জন্য ইতালি, জার্মানী ও জাপান একজোট হইল। এইভাবে 'রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী' গড়িয়া উঠে। ক্রমে ইতালি ও জাপানের মত জার্মানীও রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হইল এবং ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি অগ্রাহ্য করিয়া সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বাড়াইতে লাগিল।

ইঙ্গ-ফরাসী তোষণ-নীতি

নূতন ভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া জার্মানী স্বভাবতঃই তাহার হৃতরাজ্য ও উপনিবেশগুলি দাবি করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় জার্মানীর আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাকে বাধা দিতে সাহস না করিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া থামাইয়া রাখিতে চাহিল। ইহাই ইঙ্গ-ফরাসী 'তোষণ-নীতি' নামে পরিচিত। ফলে হিটলার সহজেই রাইন অঞ্চল ও অস্ট্রিয়া দখল করিলেন। অতঃপর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত সুদেতান অঞ্চল দখল করিতে অগ্রসর হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স 'মিউনিক চুক্তি'র মাধ্যমে হিটলারের অভিলাষ পূর্ণ করিল।

রাশিয়া অনাক্রমণ চুক্তি

বাস্তবিকপক্ষে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি এই সময় সাম্যবাদী রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাহাদের তোষণ-নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে পূর্ব ইউরোপে বাধা না দিয়া ক্রমশঃ রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে দেওয়া। এমতাবস্থায় রাশিয়ার নেতা স্টালিন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে জার্মানীর সহিত 'অনাক্রমণ চুক্তি' সম্পাদন করিলে হিটলার পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইয়াছিলেন। ফলে জার্মানীকে আর সংযত করা সম্ভব হইল না।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ইহাই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ।

প্রত্যক্ষ কারণ

ফলাফল ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল মিত্রশক্তির মধ্যে যুদ্ধকালীন চুক্তিসমূহ ও সহযোগিতার অবসান। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দেব পর রাশিয়া অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও তিক্ততার সৃষ্টি হয় যুদ্ধাবসানে তাহার পরিণতি হইল ঐ দুই শক্তির মধ্যে চরম বিভেদ। অধিকন্তু যুদ্ধান্তে আমেরিকা ও রাশিয়া পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্র অপেক্ষা এত বেশী শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল যে, তাহার ফলে অচিরেই এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। একদিকে সাম্যবাদী রাশিয়া, অন্য-দিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এই দুই শক্তির মধ্যে মতভেদ ও স্বার্থসংঘাতের ফলে যুদ্ধোত্তর বিশ্বে 'স্নায়ু-যুদ্ধে'র (cold war) সূচনা হইল। স্বভাবতঃই কোন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল না।

রাশিয়া ও আমেরিকার উত্থান—স্নায়ু-যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও ছিল এক সর্বাত্মক যুদ্ধ (Total war), যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল আরও ধ্বংসাশ্রয়ী। এই যুদ্ধে সামরিক ও অসামরিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের পরিমাপ করা আজও সম্ভব হয় নাই। লণ্ডন, বেলগ্রেড, ওয়ারশ প্রভৃতির মত জনবহুল শহর প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

ক্ষয়ক্ষতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হইল ইউরোপের পৃথিবীব্যাপী প্রাধান্যের অবসান। যুদ্ধান্তে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল।

ইউরোপের প্রাধান্যের অবসান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তীব্রতা দেখা দিয়াছিল।

জাতীয় আন্দোলন

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভার্সাই-এর চুক্তির ত্রুটি এবং বিশেষতঃ জার্মানীর প্রতি জবরদস্তি যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আমেরিকা ও রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি—এতই বৃদ্ধি যে তাহারাই হইল একমাত্র বৃহৎ শক্তি, আনুষঙ্গিক ঘটনা —বিশ্বব্যাপী 'ঠাণ্ডা লড়াই'।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক :

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। ২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক :

(১) কি কারণে ভার্সাই চুক্তির ত্রুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচ্য ? (২) বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীর আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কি নীতি অবলম্বন করিয়াছিল ?

বিষয়মুখী :

এককথায় উত্তর লিখ : (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের কত বৎসর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছিল ? (খ) কোন্ সন্ধিকে 'জবরদস্তি সন্ধি' বলা হয় ? কোন্ কোন্ রাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে শোষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) — ভার্সাই সন্ধিকে "জবরদস্তি সন্ধি" বলিয়া মনে করিত। (২) ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীতে — দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩) ইতালি — ও — একজোট হইয়া 'রোম-বার্লিন — মৈত্রী গড়িয়া তোলে। (৪) জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতিতে বাধা না দিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স — নীতি গ্রহণ করিল। (৫) জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত — অঞ্চল দখল করিতে অগ্রসর হইলে — মিউনিক চুক্তির মাধ্যমে হিটলারের অভিলাষ পূর্ণ করিল।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) কাহাদের মধ্যে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ? (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান চীনের কোন্ অঞ্চল দখল করিয়াছিল ? (৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীর সহিত রাশিয়ার কোন্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ? (৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রাশিয়ার নেতা কে ছিলেন ?

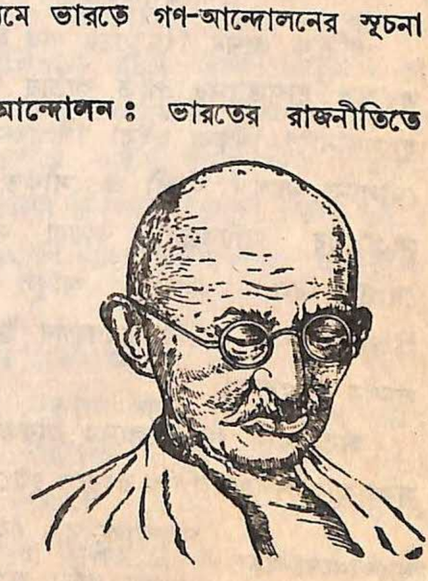
ষোড়শ অধ্যায়

ভারতবর্ষ (১৯১৯—১৯৪৭)

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর

সূচনা : জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে প্রথমে নরমপন্থী এবং পরে চরমপন্থীদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। নরমপন্থীদের মধ্যে মহামতী গোখেল, ফিরোজ শা মেহেতা ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরমপন্থীদের মধ্যে লাল-বাল-পাল অর্থাৎ লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল প্রাধান্য পাইয়া থাকেন। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলন তখনও পর্যন্ত সাধারণ লোকের আন্দোলন ছিল না। বস্তুত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পরই কংগ্রেসের আন্দোলনকে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দোলন নামে অভিহিত করা চলে। কারণ গান্ধীজিই প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে গণ-আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলন : ভারতের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান করিতেছিলেন। মহামতি গোখেল ছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু। কিন্তু গোখেলের ন্যায় তিনি ইংরাজ জাতির সহৃদয়তা ও বন্ধুত্বে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি ছিলেন অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী।



মহাত্মা গান্ধী

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত আইন' প্রবর্তিত হইবার প্রাক্কালে বৃটিশ সরকার ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে 'রাওলাট আইন'

বিধিবদ্ধ করিয়া দেশবাসীর উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলে গান্ধীজি ইহার প্রতিরোধকল্পে 'সত্যাগ্রহ সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। তাঁহার নির্দেশে দেশের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাঙ্গামা হয় পাঞ্জাবে।

জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড

সেখানে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ জেনারেল ডায়ার নিরস্ত্র অসহায় জনতার উপর গুলি চালাইবার নির্দেশ দিলেন। শত শত লোক হতাহত হইল। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিলেও, ইংলণ্ডে হাউস অব্ লর্ডসে ডায়ারের উদ্দেশ্যে সাধুবাদ ধ্বনিত হইল। এই অবস্থায় গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতবাসী ইংরাজ সরকারের সহিত সমস্ত সহযোগিতা বর্জনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

অসহযোগ আন্দোলন : ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায়

আন্দোলনের প্রস্তুতি

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল। স্বাধীনতা লাভের জন্য গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরাজরা মুসলমানদের খলিফা বা ধর্মগুরু তুরস্কের সুলতানের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া 'খিলাফৎ আন্দোলন' আরম্ভ করিল। তাহারা মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীর নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্ত সংগ্রামের পরিকল্পনা করিয়া দলে দলে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। এ-ছাড়া আবুল কালাম আজাদ, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি নেতাগণ উৎসাহের সহিত অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ ছিল এই যে, সরকারের সহিত সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করিতে হইবে এবং সংগ্রামে অহিংস থাকিতে হইবে।

আন্দোলনের স্বরূপ

আন্দোলনের একদিক—চরকা-প্রচলন, খদ্দর ব্যবহার, মাদকতা বর্জন, অস্পৃশ্যতা পরিহার, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনের দ্বারা সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা ও বিচারালয় প্রত্যাখ্যান ; অপরদিক—খেতাব-বর্জন, নীতি-বিরুদ্ধ আইন অমান্যের দ্বারা সরকারকে দুর্বল ও অচল

করা। ক্রমে অসহযোগ আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক ব্যাপক ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল।

এই আন্দোলনে সাড়া দিয়া হাজার হাজার লোক সরকারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিল। সরকারী দপ্তরে পদত্যাগ দাখিল করিল। আদালত বর্জন করিল এবং অধিকাংশ লোকই নির্বাচন বয়কট করিল। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিল। নীতি-বিরুদ্ধ আইন বা আদেশ ভঙ্গের ফলে অন্ততঃ ৩০০০ নরনারী কারাবরণ করিল। দেশময় অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হইল। ভারতের গণ-বিক্ষোভ গণ-আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

আন্দোলনের প্রসারতা

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের তীব্রতা অব্যাহত ছিল এবং ঐ বৎসর কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব পুনঃগৃহীত হইল। হিংসার আভাস সত্ত্বেও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ আইন অমান্য ও করদান বন্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। গান্ধীজি হইলেন আন্দোলনের মুখ্য পরিচালক। কিন্তু গান্ধীজির প্রধান শর্তই ছিল অহিংস আন্দোলন। এই সময় গোরক্ষপুরের অন্তর্গত চৌরিচৌরা গ্রামে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করিলে কয়েকজন পুলিস গৃহের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহার ফলে গান্ধীজি সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন স্থগিত রাখিলেন। তখন হইতে আন্দোলনের উত্তম কমিয়া আসে। তথাপি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলিতে থাকে।

আন্দোলন প্রত্যাহার

কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণ : ভারতের জাতীয় আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিকের ভূমিকা সম্পর্কে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রথম দিকে তেমন সজাগ ছিলেন না। কিন্তু গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমেই ভারতের কৃষক-শ্রমিকদের লইয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বিহারের চম্পারণে কৃষকদের অভিযোগসমূহ সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনেন এবং গুজরাটের কইরা জেলাতে কৃষকদের সত্যাগ্রহ পরিচালনা

গান্ধীজি—কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক

করেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার নেতৃত্বে কৃষককুল জয়ী হইয়াছিল। এ-ছাড়া এই সময় গান্ধীজি আমেদাবাদে মিল-মজুরদের আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। সুতরাং গান্ধীজিই ছিলেন ভারতে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রবণতা দেখা দিয়াছিল। শ্রমিকগণ ক্রমে মালিকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হইতে থাকে এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়। অতঃপর গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইলে অচিরেই কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা দিল। এই সময় শ্রমিক ধর্মঘট শুধু শিল্পাঞ্চলের মধ্যেই সীমিত রহিল না, আসামের সুদূর চা-বাগান অঞ্চলেও ধর্মঘট দেখা দিল। কৃষকদের মধ্যে খাজনা বন্ধের আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন—অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হইবার পর পাঁচ বৎসরকাল সরকারী দমননীতির ফলে সমস্ত আন্দোলন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এ-ছাড়া কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ইতিমধ্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ভারতে সমাজবাদী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটিতেছিল। সেই হেতু দেশের শ্রমিকশ্রেণীও বিভক্ত হইয়া পড়িল। অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মিগণ সমাজবাদী আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া পৃথক হইয়া গেল। অতঃপর সমাজতান্ত্রিক দল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে "শ্রমিক ও কৃষক দল" গঠন করিয়া শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করিতে থাকে। পৃথক হইলেও কিন্তু এই দল সাইমন কমিশন বয়কটের ব্যাপারে কংগ্রেসের আন্দোলনে সমর্থন জানাইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণের ফলে ১৯২৮ ও ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের গণ-আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে।

কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব—ফলশ্রুতি

সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষক দল গঠন

আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমিকা: জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ বৎসর তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন ঘোষণা করিলেন যে, ভারতকে স্বায়ত্তশাসন-দান

বৃটিশ সরকারের লক্ষ্য এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলেই সর্বশ্রেণীর ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবার নিমিত্ত বিলাতে এক 'গোলটেবিল বৈঠক' বসিবে। এ-ছাড়া এই সময় প্রায় ছয় বৎসর আমেদাবাদে অবস্থানের পর গান্ধীজি পুনরায় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন।

আইন অমান্য আন্দোলন ঃ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে গান্ধীজি আইন অমান্যের প্রস্তুতি স্বরূপ কয়েকটি জাতীয় দাবি-সমন্বিত পত্র তদানীন্তন ভাইসরয়ের নিকট প্রেরণ করেন। যথাকালে এই সকল দাবি প্রত্যাখ্যাত হইলে আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে স্থির হইল যে, গান্ধীজি নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করিবেন। তখন লবণ প্রস্তুতের ব্যাপারে সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এইজন্য ৬ই এপ্রিল লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য ৭৯ জন অনুচরসহ গান্ধীজি সবরমতী আশ্রম হইতে তাঁহার বিখ্যাত 'ডাণ্ডি অভিযান' আরম্ভ করিলেন।

ডাণ্ডি অভিযান

গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযানকে কেন্দ্র করিয়া দেশের সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল গান্ধীজি সমুদ্র উপকূলে একমুষ্টি লবণ সংগ্রহ করিয়া সরকারের আবগারি আইন ভঙ্গ করেন। ভারতের নানাস্থানে সেইদিন হইতে আইন অমান্যের কাজ আরম্ভ হয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্কুল-কলেজের ধর্মঘট, সরকারী দোকানে পিকেটিং ইত্যাদি দ্বারা আন্দোলন চালু রাখা হয়। বাংলার চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় আন্দোলনের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ এক বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করে। সর্বত্র পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা ও সভা করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

ইহার প্রভাব

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়। গান্ধীজি দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ড যাত্রা

করিলেন এবং সেখান হইতে ব্যর্থ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু

দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক

সরকার তখন গান্ধীজিকে কারারুদ্ধ করেন ও কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। সরকারের কঠোর দমন-নীতির ফলে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। গান্ধীজি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। অতপর ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তিনি আর কংগ্রেসের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন নাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে যোগ দিয়া জাপান বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় প্রাচ্য রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন : এই সময় মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় বৃটিশ সরকারকে অবিলম্বে ভারত ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কারণ তাঁহার মতে বৃটিশ শাসন বজায় থাকিলে জাপান ভারত আক্রমণ করিতে পারে। অতঃপর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট বোম্বাই-এ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব গৃহীত হইল। পরদিন ৯ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে ভারতব্যাপী যে গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তাহাই 'আগস্ট বিপ্লব'। সর্বত্র 'ভারত ছাড়' ধ্বনি উত্থিত হইল। ভারত সরকার দেশের সর্বত্র কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিল। বিশিষ্ট নেতাদের কেহই তখন আর জেলের বাহিরে ছিলেন না। ফলে নেতৃহীন বিক্ষুব্ধ জনগণ গান্ধীজির "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" (Do or Die) আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিপুল উৎসাহে সরকারের পুলিস ফাঁড়ি, রেল স্টেশন ও ডাকঘরে অগ্নিসংযোগ, রেল লাইন অপসারণ

আগস্ট বিপ্লব

এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিল। দেশময় প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। জনগণের এই স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনে কংগ্রেস নেতাগণের কিছুমাত্র দায়িত্ব ছিল না, সমস্ত দায়িত্বই ছিল তৎকালীন সরকারের। নেতৃহীন নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পুলিস গুলিবর্ষণ করে এবং অকথ্য অত্যাচার চালায়। কাজেই জনসাধারণ প্রতিশোধমূলক কার্যের দ্বারা স্থানে স্থানে সরকারকে বিপন্ন করিয়া তোলে। পরিশেষে জনগণ হিংসাত্মক

কার্যকলাপের দ্বারা অহিংসার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বলিয়া নীতিগত প্রতিবাদ হিসাবে গান্ধীজি তিন সপ্তাহ 'অনশন' করেন। এই সময় ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথগাও বিশেষ ক্ষমতাবলে গান্ধীজিকে বিনাশর্তে মুক্তি দিলেন।

নেতাজীর বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম—আজাদ হিন্দ্ সরকার : এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকার রাজনৈতিক কারণে সুভাষচন্দ্র বসুকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন (২রা জুলাই, ১৯৪০)। অতঃপর শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি কলিকাতায় স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন, কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে অন্তর্ধান করেন এবং গোপনে আফগানিস্তান ও রাশিয়ার মধ্য দিয়া জার্মানীতে গমন করেন। জার্মানীতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে তিনি যে সমুদয় ভারতীয় সৈন্য জার্মানীর হাতে বন্দী হইয়াছে তাহাদের লইয়া একটি সৈন্যদল গঠন করিয়া উহাদের সাহায্যে ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইতে চাহিলেন। জার্মান সরকার রাজী হইলেও প্রথমে ভারতীয় সৈন্যরা সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। কিন্তু পরে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়াছিল।

সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের হাতে বৃটিশ সৈন্যের পরাজয় ঘটে। এই সময় ভারতের খ্যাতনামা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে ব্যাংককে একটি বিশাল সম্মেলনে একটি প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। অবশ্য ইতিপূর্বেই জাপানের হাতে বন্দী জনৈক ভারতীয় সেনা-নায়কের চেষ্টায় সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠিত হইয়াছিল।

অচিরেই সুভাষচন্দ্র জার্মানী ত্যাগ করিয়া জাপানে উপস্থিত হইলেন (জুন, ১৯৪৩ খ্রীঃ)। ইহাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা

দেখা দিল, ফলে নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসিলেন এবং রাসবিহারী বসুর ইচ্ছানুক্রমে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের' নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। অল্পকালের মধ্যে নেতাজী (অস্থায়ী) 'আজাদ হিন্দ্' সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিলেন।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নেতাজীর 'দিল্লী চলো' মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইঙ্গ-বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করিল এবং ১৯শে মার্চ ভারত সীমান্তের মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করিল। কে প্রথম ভারতের মাটি স্পর্শ করিবে ইহা লইয়া সৈন্যদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিল। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া ইংরাজ সৈন্য মণিপুরের দিকে হটিতে লাগিল। তখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অবরোধ করিয়া আসামের অন্তর্গত কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দুর্ভাগ্যের ফলে ইম্ফল দখল করিবার পূর্বেই বর্ষা শুরু হইয়া গেল। ক্রমে গোলা-বারুদ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্যের অভাব নিদারুণভাবে বাধার সৃষ্টি করিল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের 'ভারত অভিযান'

১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে বৃটিশ সৈন্যের আক্রমণে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রেঙ্গুনে অবস্থিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বৃটিশদের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। আজাদ হিন্দ্ সৈন্যদের যুদ্ধবন্দী বলিয়া গণ্য করা হইল। ইহার পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে টোকিওর এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হয়। যদিও ভারতবাসী নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করে না।

ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের একটি বিশেষ অবদান ছিল। এইভাবে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া সৈন্যবাহিনী গঠন এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের শক্তি সঞ্চয় ও বীরত্ব-প্রদর্শন ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। এ-ছাড়া 'দেশদ্রোহী' হিসাবে আজাদ হিন্দ্ সৈন্যবাহিনীর বিচার শুরু হইলে সমগ্র দেশব্যাপী আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতাদিগের সমর্থনে এক তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। ইহাতে ইংরাজ সরকার বুঝিতে পারিল বিদেশী সরকার অপেক্ষা ভারতবাসিগণ 'দেশদ্রোহী'দের অধিক

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবদান

সম্মান দিতে প্রস্তুত। ভারতবাসিগণ তাহাদের শাসনে কতটা অসন্তুষ্ট সে-বিষয়ে ইংরাজগণ যথেষ্ট সচেতন হইয়া পড়িল।

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ—সিমলা বৈঠক : ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য বৃটিশ সরকার সচেষ্ট হইলেন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সিমলা বৈঠকে ভারতের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ একমত হইতে পারিলেন না বলিয়া বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল।

মন্ত্রী মিশন : ইহার কিছুকাল পরেই শ্রমিকদল ব্রিটেনের শাসনভার গ্রহণ করিল। নূতন বৃটিশ মন্ত্রিসভা তিনজন মন্ত্রীকে ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য এ-দেশে পাঠাইলেন। ইহা মন্ত্রী মিশন নামে পরিচিত। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুসারে শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য একটি পরিষদ গঠিত হইল। কিন্তু উহাতে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মুসলিম লীগ এই পরিষদ বর্জন করিল। মুসলমানদের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ সুপ্রসিদ্ধ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করিল এবং এই দাবি যাহাতে কার্যকর হয় তাহার জন্য ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট তারিখটি 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' বলিয়া ঘোষণা করিল। এই তারিখে একদল মুসলমান কলিকাতায় এক প্রবল হাঙ্গামার সৃষ্টি করিল। বহু হিন্দু নিহত হইল, তাহাদের ঘরবাড়ি এবং দোকানপাট লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। হিন্দুরা শীঘ্রই ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল এবং কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতার রাস্তায় অতি জঘন্য ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলিতে লাগিল।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস



জওহরলাল নেহরু

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন : ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর কংগ্রেস

জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিল মুসলিম লীগ প্রথমে উহাতে যোগ দেয় নাই, কিন্তু পরে যোগ দিয়া কেবল বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিল। লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে কোন মতেই মিলন হইল না।

মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঃ অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে দেখিয়া লর্ড ওয়াভেলের স্থানে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে পাঠান হইল (মার্চ, ১৯৪৭)।



লর্ড মাউণ্টব্যাটেন

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের সমস্যা সমাধানে নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখিলেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কোন আপস-মীমাংসা সম্ভব নহে। সুতরাং বৃটিশ সরকারের সম্মতিক্রমে তিনি ভারত-বিভাগ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। লীগ এবং কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত হইল।

সুতরাং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিল। ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করিল।

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গণ-আন্দোলনের সূচনা।

২. ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি, খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত সংযোগ, মুসলমানদের অংশ গ্রহণ—হিন্দু-মুসলমান ঐক্য।

৩. জাতীয় আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ—গান্ধীজির নেতৃত্ব—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনা—রুশ বিপ্লবের প্রভাবে সমাজবাদী আদর্শের অনুপ্রবেশ—সমাজতান্ত্রিক দল গঠন।

৪. আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমিকা ও প্রস্তুতি—গান্ধীজির নিজের পরিকল্পনামত আন্দোলনের পরিচালনাভার গ্রহণ। ডাণ্ডি অভিযান ও উহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশময় ব্যাপক জাগরণ।

৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯ খ্রীঃ) সূচনা এবং 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তুতি। গান্ধীজি সহ অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার। দেশময় প্রবল বিক্ষোভ—'আগস্ট বিপ্লব'।

৬. ১৯৪১, খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসুর ছদ্মবেশে অন্তর্ধান এবং আফগানিস্তান, রাশিয়া জার্মানী প্রভৃতি দেশে গমন। সিঙ্গাপুরে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন এবং উহার নেতৃত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর সিঙ্গাপুরে আগমন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের 'ভারত অভিযান'।

৭. ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান—বৃটিশ মন্ত্রিসভায় শ্রমিকদলের নেতৃত্বলাভ। ভারতের সমস্যা সমাধান এবং বিশেষতঃ শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে বৃটেন কর্তৃক ভারতে 'মন্ত্রীমিশণ' প্রেরণ।

৮. মুসলিম লীগে জিন্নার নেতৃত্ব—মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবি—'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ডাক এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা'।

৯. জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন—লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভারত আগমন—ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক ঃ

১। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ২। ভারতে জাতীয় আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৩। কাহার নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়? ঐ আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৪। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৫। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কার্যকলাপ ও উহার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(১) অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ কি ছিল? (২) কিভাবে গান্ধীজি ভারতে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন? (৩) কিভাবে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন? (৪) কিভাবে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্ণধার হন? (৫) লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আগমনের পর কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়?

বিষয়মুখী :

এক কথায় উত্তর দাও : (ক) কাহার নির্দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় ? (খ) ভারতে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কে ছিলেন ? (গ) কি সংগ্রহ করিয়া গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন ? (ঘ) কোন্ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া 'আগস্ট বিপ্লব' অনুষ্ঠিত হয় ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) — ছিলেন গান্ধীজির রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু। (২) রাওলাট আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সরকার বিপ্লবীদের উপর অত্যাচার শুরু করিলে গান্ধীজি — স্থাপন করেন। (৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলমানরা খলিফার প্রতি ইংরাজদের কঠোর ব্যবহারের প্রতিবাদে — আন্দোলন আরম্ভ করে। (৪) অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছাত্রেরা — ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। (৫) ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইলে — হইলেন উহার মুখ্য পরিচালক। (৬) —ছিলেন ভারতে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। (৭) — চুক্তির ফলে আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। (৮) — সালের ৮ই আগষ্ট — এর কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ভারত ছাড় প্রস্তাব গৃহীত হয়। (৯) আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অবরোধ করিয়া আসামের অন্তর্গত — পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও :

(১) লাল-বাল-পাল বলিতে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে বুঝায় ? (২) গান্ধীজি কোন্ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে গণ-আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন ? (৩) অসহযোগ আন্দোলন কোন্ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল ? (৪) চৌরিচৌরা গ্রাম কোথায় অবস্থিত ? (৫) গান্ধীজি বিহার ও গুজরাটের কোন্ কোন্ স্থানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন ? (৬) কোন্ বিপ্লবের প্রভাবে ভারতে সমাজবাদী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল ? (৭) গান্ধীজি কোন্ স্থান হইতে ডাণ্ডি অভিযান শুরু করিয়াছিলেন ? (৯) নেতাজী কোথায় গিয়া আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন করিয়াছিলেন ?

সপ্তদশ অধ্যায়

(ক) চীনের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯ খ্রীঃ)

প্রজাতন্ত্রে ভাঙন ঃ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও শুরু হইতেই প্রজাতন্ত্রে ভাঙন দেখা দিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ ছিল নব-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ইউ-য়ান্-সিকাই ও সান্-ইয়াৎ-সেনের অন্তর্কলহ। ইউ-য়ান্ ছিলেন অতীব ক্ষমতা-লিপ্সু। প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। ইতিমধ্যে সান্-ইয়াৎ-সেন কুয়োমিন্ তাঙ্ বা জাতীয় দল (১৯১২ খ্রীঃ) গঠন করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃই এই জাতীয় দলের সহিত নূতন প্রজাতন্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়। এদিকে এই সময় ইউ-য়ান্ সমস্ত ক্ষমতা দখল করিয়া গণতন্ত্রের বদলে সামরিক একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় সহসা তাঁহার মৃত্যু হইলে প্রজাতন্ত্র অনেকটা বিপদমুক্ত হইল।

কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের উত্থান ও প্রজাতন্ত্রের সহিত বিরোধ

ইতিমধ্যে চীনে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে তু-চুন বা যোদ্ধৃগোষ্ঠী স্ব-স্ব এলাকায় ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল। ইহারা সকলেই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিত বলিয়া চীনে গৃহযুদ্ধের অন্ত ছিল না।

তু-চুন-দের প্রাধান্য

চীনের এই দুর্দিনে বিপ্লবীরা হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও সান্-ইয়াৎ-সেন কিন্তু আত্মপ্রত্যয় হারান নাই। ইউ-য়ানের সহিত অন্তর্কলহের সূত্র ধরিয়া তিনি কুয়োমিন তাঙ্ দলের সহায়তায় দক্ষিণ চীনে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। দলের কর্মসূচী হিসাবে তিনটি মৌলিক নীতি প্রকাশ করা হইল। এই নীতিগুলি হইল ঃ (১) বিদেশীরা চীনে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সেগুলি অবসান ও চীনে পূর্ণ

দক্ষিণ চীনে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের তিনটি মৌলিক নীতি

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ; (২) চীনে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা ; (৩) ভূমি-আইনের সংস্কার ও নানা ধরনের কলকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবিকার সন্ধান।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়া চীন ইউরোপীয় দেশসমূহের সহিত অসম চুক্তিসমূহের পুনর্বিবেচনা ও সান্তুং প্রদেশ ফেরত চাহিয়াছিল। সান্তুং প্রদেশে ইতিপূর্বে জার্মানরা বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেন। এমতাবস্থায় জাপান চাপ সৃষ্টি করিলে মিত্র-শক্তিবর্গ চীনের সমস্ত দাবি নাকচ করিয়া দিলেন এবং সান্তুং প্রদেশে জাপানের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। স্বভাবতঃই চীনের অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইল। চীনের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সম্প্রদায় ৪ঠা মে'র আন্দোলনের মাধ্যমে জাপানী পণ্যের বয়কট শুরু করিল।

৪ঠা মে'র আন্দোলন

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় চীনের কমিউনিস্ট দলের সহিত কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের কোন বিরোধ ছিল না। সেই সময় চীনের কমিউনিস্ট দল রাশিয়ার নির্দেশে চলিত। সেই কারণে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সান্ রুশ প্রতিনিধির সহিত আলাপ-আলোচনায় বসেন। এই আলোচনায় স্থির হইয়াছিল যে, যদিও চীনে কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া উঠে নাই, তথাপি রাশিয়া কমিউনিস্ট আদর্শে কুয়োমিন্ তাঙ্ দলকে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে পরামর্শদাতা প্রেরণ করিবে। এ-ছাড়া কুয়োমিন্ তাঙ্ দলকে চীনে নব-প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট দলকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করিবার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছিল। ফলে অচিরেই কুয়োমিন্ তাঙ্ দল রাশিয়ার কমিউনিস্ট আদর্শের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পুনর্গঠিত হইল। অতঃপর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিন্ তাঙ্ দল প্রথম কংগ্রেসে সমবেত হইয়া তিনটি নীতি গ্রহণ করিল। এই নীতি তিনটি হইল : (১) সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত মৈত্রী বন্ধন ; (২) চীনের কমিউনিস্ট দলের সহিত মৈত্রী স্থাপন এবং (৩) শ্রমিক ও কৃষকদের সমর্থন।

সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু—চীনের কমিউনিস্ট দলের সহিত কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের সম্পর্ক

ডঃ সান্‌-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান অনুচর মার্শাল চিয়াং কাইশেক কুয়োমিন্‌ তাঙ্‌ সরকারের রাষ্ট্রপতি হন। চিয়াং প্রথমেই কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধিতে তৎপর হন। তু-চুনদের (যোদ্ধৃগোষ্ঠী) দমন করিয়া তিনি একে-একে প্রদেশগুলি দখল করিতে থাকেন। ফলে নানকিং, সাংহাই, পিকিং প্রভৃতি স্থান কুয়োমিন্‌ তাঙ্‌ সরকারের অধীনে আসিল। এইবার তিনি কমিউনিস্টদের দমন করিতে চাহিলেন।

চিয়াং কাইশেক—কমিউনিস্টদের দমন

ইতিমধ্যে যদিও কমিউনিস্টদের কুয়োমিন্‌ তাঙ্‌ দলের সদস্যভুক্ত করা হইয়াছিল, তথাপি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের পর এই দুই দলের মধ্যে আর কোন ঐক্য রহিল না। কারণ দেশের শিল্পপতি ও সামরিক প্রভুগণ কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলন প্রতিহত করিবার জন্য চিয়াং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং কমিউনিস্ট সদস্যদের কুয়োমিন্‌ তাঙ্‌ দল হইতে বহিষ্কার করেন এবং স্থানে স্থানে কুয়োমিন্‌ তাঙ্‌ দলের সহিত কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ আরম্ভ হয়।


চিয়াং কাইশেক

এই সময় চীনে কমিউনিস্টদের নেতা ছিলেন মাও-সে-তুঙ ও চু-তে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ভূমি-সংস্কার, গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি ও স্বয়ংশাসিত সোভিয়েত গঠন তাঁহাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার প্রতিরোধ-কল্পে চিয়াং সরকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান চালাইয়াছিলেন। এই অবস্থায় কমিউনিস্টদের প্রধান কার্যালয় অবরোধ করা হইলে প্রায় নব্বই হাজার কৃষক-শ্রমিক লইয়া গঠিত মুক্তিফৌজ মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের দক্ষিণ ও মধ্যভাগ হইতে উত্তর-পশ্চিম

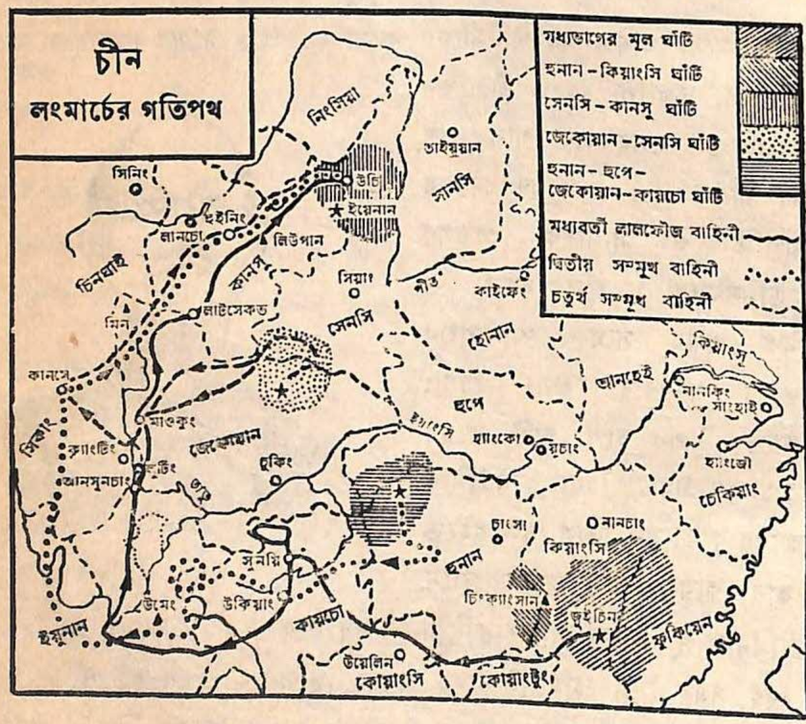
মাও-সে-তুঙ ও চু-তে'র নেতৃত্ব

অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করে। পথে অনেক বাধা-বিপত্তি ছিল। তথাপি

লংমার্চ

ষোল হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ের বরফ ডিঙ্গাইয়া, দুই হাজার মাইলের তৃণভূমি অতিক্রম করিয়া এবং চিয়াং সৈন্য-বাহিনীর আক্রমণের মোকাবিলা করিয়া ঐ বিশাল বাহিনী আঠার মাসে ৬০০০ মাইল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সোভিয়েত সীমান্তের নিকটস্থ সেনসিতে পৌছায়। এই ঘটনা লংমার্চ নামে পরিচিত।

লংমার্চের পরেও কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ বন্ধ



হয় নাই। কমিউনিস্টরা তখন জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য জাতীয়তা-বাদী দলের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে চাহিয়াছিল। সেইজন্য তাহারা কুয়োমিন্‌তাঙ্‌ সৈন্যবাহিনীর উপর প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়। ফলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে

সিয়াং-ফু ঘটনা

চিয়াং কাইশেক স্বয়ং সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য সামরিক বাহিনীর প্রধান কার্যালয় সিয়াং-ফু'তে আসিয়া হাজির হইলে অতর্কিতে তাঁহাকে হরণ করা হয়। এইভাবে পনর

দিন বন্দী অবস্থায় কাটাইয়া চিয়াং সোভিয়েত সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে মুক্তিলাভ করেন। চিয়াং কমিউনিস্টদের প্রস্তাব মানিয়া লইলেন, ফলে উভয় দল যৌথভাবে জাপানকে প্রতিহত করিতে স্বীকৃত হইল। ইহা সিয়াং-ফু ঘটনা নামে বিখ্যাত।

চিয়াং ও মাও-এর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা—দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন

ইতিমধ্যে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল চিয়াং সরকারের সহিত জাপানের বিরুদ্ধে মিলিত হয়। স্বভাবতঃই কমিউনিস্ট দল এই সময় কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ বা গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের জমি দখল প্রভৃতি কর্মসূচী স্থগিত রাখিয়াছিল। এ-ছাড়া লালফৌজের পুনর্গঠন করিয়া তাহাদের জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যে রূপান্তরিত করা হইল। এক্ষণে এই সৈন্যবাহিনী চিয়াং-এর নেতৃত্বাধীন হইল। পক্ষান্তরে চিয়াং সরকার কমিউনিস্ট সৈন্যবাহিনীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিল, তাহাদের কার্যকলাপের জন্যও স্বতন্ত্র এলাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অতঃপর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট দল চিয়াং সরকারের সহিত একজোট হইয়া "দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট" গঠন করে। এই সময় জাপানীরা রাজধানী পিকিং দখল করিলে কমিউনিস্ট ও চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদল একযোগে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার পর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সম্পূর্ণভাবে ঐ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল তখন চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। চিয়াং

চিয়াং সরকারের দুর্নীতি

সরকার ছিল অতীব দুর্নীতিপরায়ণ। মন্ত্রী ও কর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ, সরকারের প্রাপ্য কর না-দেওয়া, সরকারের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা প্রভৃতি অনাচার অবাধে চলিতে থাকে। সাধারণ লোকের দুর্গতির সীমা ছিল না, কারণ ধনীদের সহায়তা করিতে গিয়া চিয়াং সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন জাপান মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন

কুয়োমিন্ তাঙ্ সৈন্যদল চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করিতেছিল। এমতাবস্থায় জাপানের সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র কমিউনিস্ট দলের হস্তগত হয়। কমিউনিস্টরা তখন চীনের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে ছড়াইয়া ছিল। এ-ছাড়া ইতিপূর্বে কমিউনিস্ট দল রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যার্থে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। এক্ষণে জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিলে রাশিয়ার সমরসম্ভারও কমিউনিস্টদের অধিকারে আসে। ফলে অচিরেই কুয়োমিন্ তাঙ্ ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে প্রকাশ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কুয়োমিন্ তাঙ্ ও কমিউনিস্ট দলের গৃহযুদ্ধের সূচনা



মাও-সে-তুঙ

এই গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টদের দমন করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং সরকারকে প্রভূত অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কুয়োমিন্ তাঙ্ দলেও ভাঙ্গন দেখা দিয়াছিল এবং ঐ দলের অনেক সদস্যই কমিউনিস্ট দলভুক্ত হয়। এই সমুদয় কারণে গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্ট দলই জয়যুক্ত হইল এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং সরকার চীনের মূল ভূখণ্ড ত্যাগ করিয়া ফরমোজা বা তাই-ওয়ান দ্বীপে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন।

কুয়োমিন্ তাঙ দলে ভাঙ্গন—চিয়াং-এর পতন ও বহিষ্কার

চীনের মূল ভূখণ্ডে ঐক্য—মাও-সে তুঙ

ইতিমধ্যে নানকিং দখল করিয়া ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কমরেড মাও-সে-তুঙ চীনে 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। অতঃপর অক্টোবর মাসে ক্যাণ্টন হস্তগত হইলে কুয়োমিন্ তাঙ্ সৈন্যের সমস্ত প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফলে ঐ মাসেই চীনের মূল ভূখণ্ডে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট দলের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। এই ভাবে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। মাও-সে-তুঙ ছিলেন ইহার প্রথম সভাপতি।

(খ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব

সূচনা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধের শেষে জাপান ঐ সকল দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, কিন্তু দেশের লোকের হাতে বহু অস্ত্রশস্ত্র দিয়া গেল। সেইসব অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা তাহাদের শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিল।

জাপানের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন

ইন্দোচীন ঃ আনাম, কম্বোডিয়া (কাম্পুচিয়া) ও লাওস ফরাসীদের অধীনে ফরাসী ইন্দোচীন নামে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান এই স্থানটি দখল করে। যুদ্ধের শেষে জাপান পরাস্ত হইয়া পলাইয়া গেলে এই সব দেশের লোকেরা স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে আনামের রাজা বাওদাইকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জাতীয় নেতা হো-চি-মিনের সভাপতিত্বে ভিয়েতনামে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এমতাবস্থায় ফরাসীরা বাওদাই-এর পক্ষ লইল। সেই মত ফ্রান্সের সহিত বাওদাই-এর একটি চুক্তি হইল। ইহা দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে, ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিবে না তবে ভিয়েতনাম ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রহিবে এবং সেখানে ফরাসী সৈন্য মোতায়েন থাকিবে। অতঃপর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব সার্থক হইলে কমিউনিস্ট চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন হো-চি-মিন প্রতিষ্ঠিত সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। পক্ষান্তরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড বাওদাইকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়।

হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

চীনের বিপ্লবের প্রভাব

ইতিমধ্যেই হো-চি-মিন প্রতিষ্ঠিত সরকারের সহিত ফরাসী সেনাবাহিনীর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর অনর্থক যুদ্ধের পর ফরাসীরা আশা ছাড়িয়া দিল সুতরাং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভা কন্‌ফারেন্সে এক চুক্তি দ্বারা ভিয়েতনাম দুইভাগে বিভক্ত হইল। উত্তরভাগ হো-চি-মিনের

জেনেভা কনফারেন্স—ভিয়েতনাম বিভাজন

সভাপতিত্বে একটি কমিউনিস্ট প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইল। ইহার নাম হইল ভিয়েতমিন (Vietminn) এবং রাজধানী হইল হ্যানয়। দক্ষিণভাগের নাম রহিল ভিয়েতনাম এবং রাজধানী হইল সাইগন। ইন্দোচীনের আর দুইটি রাজ্য কম্বোডিয়া (কাম্পুচিয়া) ও লাওস ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিলে ব্রহ্মবাসিগণ বৃটেনের অধীনতা মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে জাপানীদের সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু পরে তাহারা আবার মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানীদের উৎখাতের ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিল। যুদ্ধের পর ব্রহ্মদেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিলে বৃটিশ সরকার ব্রহ্মবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দানে রাজী হইল। ব্রহ্মের জনগণই সে-দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সেইমত ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ব্রহ্মদেশে সংবিধান সভা গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ঐ সংবিধান সভার ইচ্ছা অনুযায়ী বৃটিশ পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়ন করিয়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বৃটেন কর্তৃক স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কে অঙ্গীকার

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ

মালয়েশিয়া ঃ ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মালয়, সিঙ্গাপুর, সারবাক, উত্তর বোর্ণিও বা সাবা প্রভৃতি রাষ্ট্র সংঘবদ্ধ হইয়া মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই সকল অঞ্চলে বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে মালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ইহার ফলে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড মালয়ের স্বাধীনতা স্বীকার করে। এদিকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাজ্ক্ষা মালয়ের সংলগ্ন সিঙ্গাপুর, সারবাক, সাবা প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কারণে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার

মালয়ের স্বাধীনতা লাভ

এই সমুদয় অঞ্চলের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু অতঃপর এই সকল ক্ষুদ্র অথচ স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে সাম্যবাদী চীনের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে বা চীন একে একে ঐ সমুদয় অঞ্চল গ্রাস করিতে পারে এইরূপ যুক্তি খাড়া করিয়া মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলিল। ইহারই পরিণতি হইল মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম।

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা

ইন্দোনেশিয়া: ইন্দোনেশিয়ায় হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ঐ দেশ অধিকার করিয়াছিল। ক্রমশঃ ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া উঠে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। ফলে যুদ্ধের শেষে দেশের জাতীয় দল সুকর্ণ নামক এক নেতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া জাপানীদের হাত হইতে শাসনক্ষমতা দখল করিয়া ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল। ইহার রাজধানী ছিল জাকার্তা। চার বৎসর পরে পূর্ব ইন্দোনেশিয়ায় আর একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার রাজধানী হইল ম্যাকাসার। হল্যাণ্ড সরকার সৈন্যের সাহায্যে ইহা প্রতিরোধের চেষ্টা করিল। কিন্তু দেশের মধ্যে বিদ্রোহ তখন এতই বিস্তারলাভ করিয়াছিল যে, তাহা দমন করা হল্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। চার বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং নিউগিনি ছাড়া বাকী সমস্ত ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজ লইয়া ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

জাতীয় দল—সুকর্ণ

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রধানতঃ ভারত, বর্মা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরাধীন ছিল। এই সকল দেশে ইতিপূর্বেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান এশিয়ার রণাঙ্গনে জয়ী হইয়া অচিরেই ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া,

জাপানের অগ্রগতি ও উহার ফলাফল

মালয়, বর্মা প্রভৃতি স্থান অধিকার করে। ফলে ঐ সকল স্থান সহসা ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হইয়া যে মুক্তির আস্বাদ পাইল তাহাতে তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল আগস্ট বিপ্লব (১৯৪২ খ্রীঃ) এবং নেতাজীর ভারত ত্যাগ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নামক জাতীয় বাহিনী গঠন।

অতলান্তিক সনদ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজে মিলিত হইয়া আটটি আদর্শ-সংবলিত বিশ্বশান্তি-রক্ষার নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা 'অতলান্তিক সনদ' নামে খ্যাত। ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার বিস্তার নীতি পরিত্যক্ত হইবে, প্রত্যেক জাতির নিজের পছন্দমত স্বাধীন সরকার গঠনের অধিকার থাকিবে, অস্ত্র সংবরণ করিতে হইবে ইত্যাদি অতলান্তিক সনদে ঘোষিত আদর্শসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আটটি আদর্শ-সংবলিত বিশ্ব-শান্তি রক্ষার নীতি

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিদীর্ণ পৃথিবীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকা ও ইংলণ্ড একটি নূতন আন্তর্জাতিক সংগঠনের গোড়াপত্তন করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষিত অতলান্তিক সনদ-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ২৬টি জাতি একটি সম্মিলিত 'ঘোষণা পত্রে' স্বাক্ষর করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এই সনদের আদর্শসমূহের প্রতি তাহাদের আস্থা জ্ঞাপন করে। অতঃপর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো নগরে চীন, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া 'একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র সংস্থা' গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইহা 'মস্কো ঘোষণা' নামে অভিহিত। এই ভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিত্তি প্রস্তুত হইলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমেরিকার স্যানফ্র্যান্সিস্কো শহরে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আনুষ্ঠানিক-ভাবে স্থাপিত হইল। এই অধিবেশনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ গৃহীত হয়।

অতলান্তিক সনদ ও মস্কো ঘোষণা

স্যানফ্র্যান্সিস্কো অধিবেশন

ইহার উদ্দেশ্য : জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হইল—(১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ; (২) সম-অধিকার এবং প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্প্রসারণ। (৩) অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিমূলক বা মানবিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করা ; (৪) এই সমুদয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার কেন্দ্র হিসাবে জাতিপুঞ্জ কাজ করিবে।

সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী, ইতালি ও জাপান এই তিনটি রাষ্ট্র সম্পূর্ণ দুর্বল ও নিরস্ত্রীকৃত হইল এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এত দুর্বল হইয়া পড়িল যে, সাম্যবাদী রাশিয়াকে বাধা দিবার মত শক্তিই তাহাদের আর রহিল না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র খুব শক্তিশালী হইলেও তাহার অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত তত বেশি ছিল না। কাজেই রাশিয়াকে বাধা দিবার মত শক্তি তাহার আর রহিল না। ইতিমধ্যে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে বহু সমাজতান্ত্রিক দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে রাশিয়া উহাদের শাসনক্ষমতা দখলে সাহায্য করিল। এইভাবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ায় এবং পরবর্তী তিন বৎসরে রুমানিয়া, বুলাগেরিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় 'জনসাধারণের গণতন্ত্র' নামে এক নূতন ধরনের সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে 'স্বাধীন' হইলেও ইহারা সকলেই রাশিয়ার আশ্রিত বা কুক্ষিগত হইল।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

এ-ছাড়া যুদ্ধোত্তর কালে ইরানের আজারবাইজান অধিকার ও গ্রীসের গৃহযুদ্ধে তথাকার সাম্যবাদী দলকে উৎসাহ-দান, পূর্ব জার্মানীতে প্রাধান্য বিস্তার এবং সর্বোপরি চীনের সমাজতান্ত্রিক দলকে সাহায্য-সহায়তা দান প্রভৃতি সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতির অঙ্গ হইয়া উঠে।

রুশ পররাষ্ট্র নীতি—সাম্যবাদের সাফল্যে সাহায্যদান

সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের বিস্তার : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফল হইল বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে ইউরোপের

দেশগুলির প্রাধান্যের অবসান। ইহার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ইউরোপীয় দেশসমূহের অধীন উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তীব্রতা সঞ্চারিত হইল। এই সকল আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। এই সকল আন্দোলন ক্রমশঃ সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিলে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাসকল্পে প্রথমে স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন এবং অবশেষে স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হইল। ক্রমে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং-অতঃপর মালয় ও সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়াখণ্ডে, বিশেষতঃ ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনে এই পর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তীব্রতা সঞ্চার: ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতির স্বাধীনতা লাভ

অতঃপর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সাম্যবাদী দল জয়ী হইয়া সরকার প্রতিষ্ঠা করিলে এশিয়াখণ্ডে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্প্রসারিত হইল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ফরাসী ইন্দোচীনে সাম্যবাদের প্রসার এবং হো-চি-মিন-এর নেতৃত্বে ইন্দোচীনের অন্তর্গত উত্তর ভিয়েতনামে ভিয়েতমিন সরকার প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চীনে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন ও উহার প্রভাব

● বিষয় সংক্ষেপ ●

১. চীন: ইউ-য়ান-সিকাই ও সান-ইয়াৎ সেনের মধ্যে অন্তর্কলহ—ইউয়ান কর্তৃক সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং আকস্মিক মৃত্যু (১৯১৬ খ্রীঃ)।

২ যোদ্ধৃগোষ্ঠীর :নিজ নিজ এলাকায় প্রাধান্য—কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সংকোচন, সান-ইয়াৎ সেন কর্তৃক দক্ষিণ চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—দলের তিনটি মৌলিক নীতি ঘোষণা।

৩. ৪ঠা মের আন্দোলন—বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব।

৪. সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু—তাঁহার আমলে রাশিয়ার সহিত চীনের কমিউনিস্টদের সম্পর্ক—চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্ব গ্রহণ—দেশের শিল্পপতি ও সামরিক প্রভুদের সহায়তায় কুয়োমিন তাঙ দল হইতে কমিউনিস্টদের বিতাড়ন।

৫. কমিউনিস্টদের নেতৃত্বদানের জন্য মাও-সে-তুঙের আবির্ভাব—লংমার্চ।

৬. চিয়াং কর্তৃক কমিউনিস্টদের প্রস্তাব সমর্থন—চিয়াং ও মাও-এর যৌথ উদ্যোগ। একযোগে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান (১৯৪৫ খ্রীঃ)—চিয়াং সরকারের দুর্নীতি ও অনাচার, কমিউনিস্টদের সমরসম্ভার লাভ—কুয়োমিন্ তাঙ্ ও কমিউনিস্ট দলের গৃহযুদ্ধ—যুদ্ধান্তে কমিউনিস্ট দলের সাফল্য: চীনের মূল ভূখণ্ডে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৮. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের মধ্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব—ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাবলী। পরাধীন দেশগুলির মুক্তিলাভের প্রয়াস।

৯. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন শান্তির প্রচেষ্টা—অতলান্তিক সনদ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রস্তুতি—জাতিপুঞ্জের জন্ম ও উদ্দেশ্য।

১০. পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার কুক্ষিগত সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন—ইরাণ, পূর্ব জার্মানী ও চীনে সমাজতান্ত্রিক দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

১১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তীব্রতা সঞ্চার। ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা অর্জন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ও চীনে জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিসঞ্চয়। চীনে সাম্যবাদী দলের সাফল্য।

প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক:

১। কিভাবে সান-ইয়াৎ-সেনের আমলে চীনে কমিউনিস্ট দলের উত্থান হইয়াছিল? ২। কমিউনিস্টদের দমনের উদ্দেশ্যে চিয়াং সরকারের কার্যাবলী

সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর কিভাবে চীনে মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে বিপ্লব সফল হইয়াছিল? ৪। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ও উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা জান লিখ॥

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক ঃ

(১) কিভাবে ৪ঠা মে'র আন্দোলন শুরু হইয়াছিল? (২) মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে লংমার্চ সম্পর্কে কি জান? (৩) সিয়াং ফু'র ঘটনা বলিতে কি বুঝ? (৪) ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিভাবে শুরু হইয়াছিল? (৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রহ্মদেশের জাতীয় আন্দোলন ও উহার পরিণতি সম্পর্কে কি জান? (৬) কিভাবে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল? (৭) কিভাবে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হইয়াছিল? (৮) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাধীন দেশগুলিতে কিভাবে জাতীয়তাবাদের বিকাশ হইয়াছিল? (৯) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে কি জান?।

বিষয়মুখী ঃ

এক কথায় উত্তর দাও ঃ (ক) ৪ঠা মে'র আন্দোলনে কাহারা নেতৃত্ব দিয়াছিল? (খ) চিয়াং কাইশেক কাহাদের বিরুদ্ধে দমন-নীতি চালু করিয়াছিলেন? (গ) ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর চিয়াং কাইশেক কোথায় বহিষ্কৃত হন? (ঘ) বিশ্বের কোন্ দুই নেতা মিলিত হইয়া অতলান্তিক সনদ ঘোষণা করেন?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে — চীনে স্ব স্ব এলাকায় ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল। (২) সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান অনুচর — সরকারের রাষ্ট্রপতি হন। (৩) ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং — সদস্যদের কুয়োমিন্ তাঙ্ দল হইতে বহিষ্কার করেন। (৪) চীনে কমিউনিস্ট দলের নেতা ছিলেন —। (৫) — সিয়াংফু'তে হাজির হইলে অতর্কিতে তাঁহাকে হরণ করা হয়। (৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র — দলের হস্তগত হয়। (৭) ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে — সভাপতিত্বে ভিয়েতনামে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। (৮) ইন্দোনেশিয়ায় — সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। (৯) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট — ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী — অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে এক বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজে মিলিত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দাও:

(১) ৪ঠা মে'র আন্দোলনে কাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিল? (২) কোন্ বৎসর হইতে কুয়োমিন্ তাঙ্ দল ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয়? (৪) লংমার্চে কে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন? (৫) কোন্ ঘটনার পর চিয়াং কমিউনিস্টদের প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিলেন? (৬) কোন্ বৎসর কমিউনিস্ট দল চিয়াং সরকারের সহিত 'দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট' গঠন করিয়াছিল? (৭) কোন্ কনফারেন্সে ভিয়েৎনাম দুইভাগে বিভক্ত হয়?